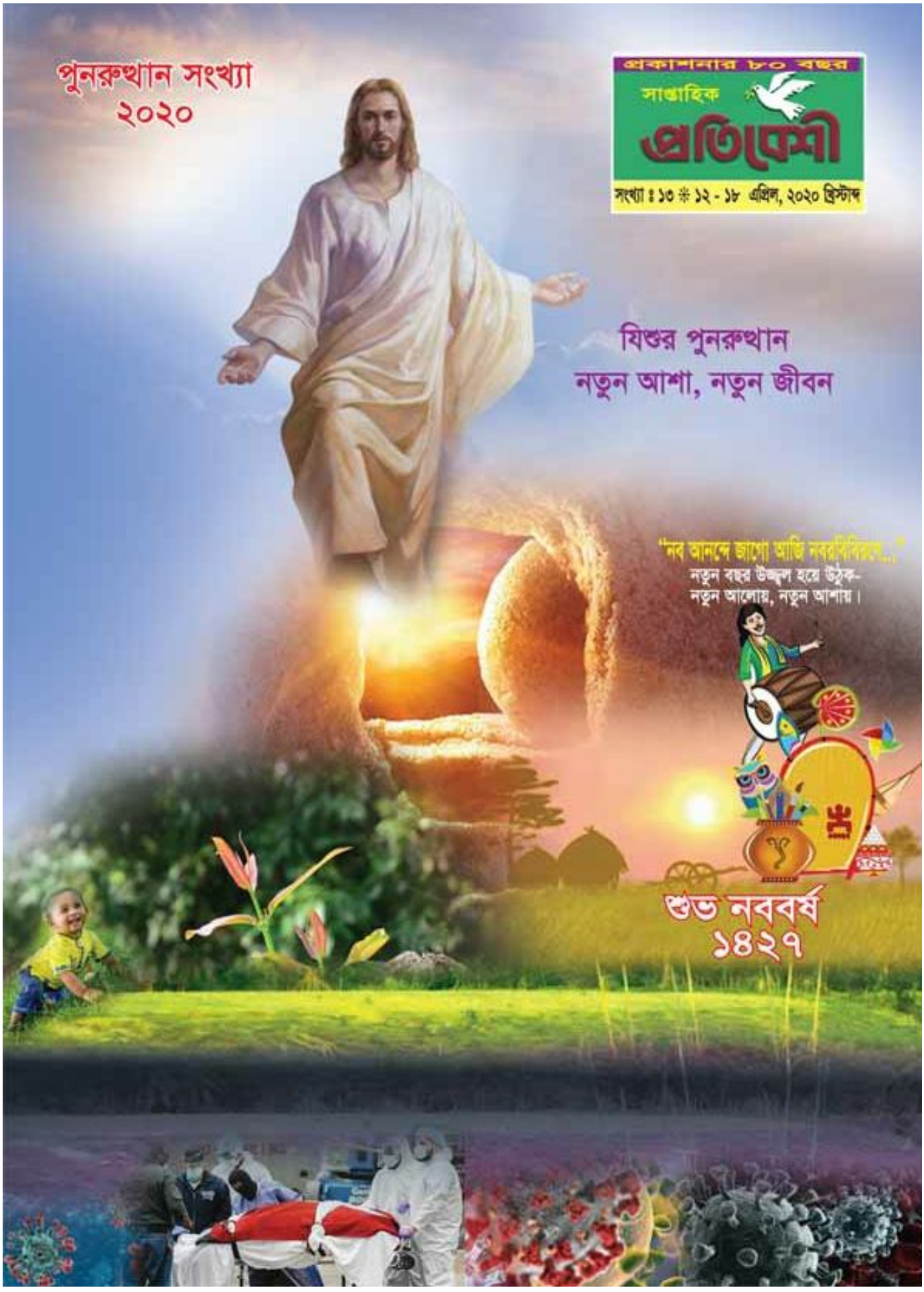

পুনরুত্থান সংখ্যা
২০২০
প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা ঃ ১৩ ※ ১২ - ১৮ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
যিশুর পুনরুত্থান
নতুন আশা, নতুন জীবন
"নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে..."
নতুন বছর উজ্জ্বল হয়ে উঠুক-
নতুন আলোয়, নতুন আশায়।
শুভ নববর্ষ
১৪২৭

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।

১৪ এপ্রিল ২০১০, দেখতে দেখতে ১১টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে-বৌ : বাবু মার্কুস গমেজ ও মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জ্বলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক ও আনন্দ।

৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পুনরুত্থান সংখ্যা, ২০২০

বর্ষ : ৮০ সংখ্যা : ১৩

১২ - ১৮ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ▌২৯ চৈত্র, ১৪২৬ - ৫ বৈশাখ, ১৪২৭বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বিজয়ী হবার আশাদানে উদ্‌যাপিত হোক যিশুর পুনরুত্থান পর্ব

এবছর ১২ এপ্রিল সারাবিশ্বে 'পুনরুত্থান পর্ব' উদ্‌যাপিত হবে। সারাবিশ্বে যেমনি তেমনি বাংলাদেশেও তা **'ইস্টার সানডে'** হিসেবেই বেশি পরিচিত। খ্রিস্টানদের জন্য তা অবশ্যই পালনীয় একটি পর্ব; যা দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে আনন্দোৎসবে পালিত হয়। কেননা এদিনে স্মরণ করা হয় মানব মুক্তিদাতা যিশু মৃত্যুকে জয় করে কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন। যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী। তবে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার আগে যিশুকে নিদারণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, হতে হয়েছে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, গ্রহণ করতে হয়েছে অন্যায় ও প্রহসনমূলক বিচার, সহ্য করতে হয়েছে মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা এবং শেষে ক্রুশীয় মৃত্যুর যন্ত্রণাও নিয়েছেন যিশু। এখানেই শুধু শেষ নয়, মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শের সাথে কবরের নিকষ কালো অন্ধকারের অভিজ্ঞতাও নিয়েছেন যিশু। তবে তিনি মৃত্যু ও অন্ধকারকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়ে মানুষকে অভয় দিচ্ছেন ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থেকে মানুষ অন্ধকারকে জয় করতে পারে।

কোন কিছুই যিশুর পুনরুত্থানে বাঁধা হয়ে থাকতে পারেনি। তবে জীবনের কঠিনতম বাস্তবতাগুলো মোকাবেলা করেই যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন। আর যিশুর পুনরুত্থান আমাদের সকল মানুষকে আশান্বিত করছে জীবনের কঠিনতা ও সংকট মোকাবেলা করে সফলতার দিকে এগিয়ে চলতে। করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব বর্তমানে অতীব সংকটময় সময় পার করছে। যার প্রভাব পড়েছে জীবনের সর্বস্তরে। শিক্ষা থেকে রাজনীতি, সমাজ থেকে ধর্ম; সবকিছুতেই করোনার বিরূপ প্রভাব। পুনরুত্থান উৎসবের জন্য বিশ্বাসীরা সংঘবদ্ধভাবে কোন কিছু করতে পারছে না। খ্রিস্টীয় জীবনের আধ্যাত্মিকতার পরম সময় পুণ্য সপ্তাহেও খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সরাসরি উপাসনা করতে পারছে না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাজকেরা সরাসরি বৃহৎ পরিসরে যজ্ঞীয় ও সাক্রামেন্তীয় সেবা দিতে পারছেন না। তাই যাজক ও ভক্তজনগণ উভয়ের মধ্যেই রয়েছে ক্ষত ও কষ্ট। পুনরুত্থান পূর্ববর্তী যিশুর জীবনেও ছিল নিদারুণ কষ্ট ও ক্ষত। মানুষের মঙ্গলের জন্য যিশু তা গ্রহণ করেছিলেন। আমরাও মানুষের মঙ্গলের জন্য এ বিশেষ অবস্থাটা গ্রহণ করি। মানব জীবনের চরম শত্রু মৃত্যুকে জয় করে যিশু তাঁর ক্ষমতা মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে আমরাও মৃত্যুদূত করোনাভাইরাসকে জয় করার ক্ষমতা রাখি তা সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি।

করোনাভাইরাসকে পরাজিত করার পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। যার যার মত করে কোন কোন দেশ এই ভাইরাসটির বিস্তার রোধ ও প্রতিষেধক তৈরির প্রচেষ্টা নিয়েছেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই মনে করছেন, করোনা জয়ে বিশ্বকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সত্যিই সমন্বিতভাবে কাজ করলেই বিজয়ী হওয়া যাবে। বাংলাদেশেও করোনার ছোবল তীব্র হচ্ছে। ভীত ও আতঙ্কিত না হয়ে তা মোকাবেলা করার জন্য সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। সরকার ও বেসরকারী সেক্টরগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এগিয়ে যেতে হবে। কঠিন হলেও আমাদের তথাকথিত বাহাদুরি ও বদভ্যাসগুলো বাদ দিতে হবে। প্রত্যেকের ছোট ছোট ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা একজন আরেকজনকে বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করতে পারি। পুনরুত্থানের কিছু পূর্বাবাস আমরা এই সময়ে দেখতে পাচ্ছি। যিশুর মত অপরের মঙ্গলের জন্য বা অন্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেউ কেউ নিজেকে দান করছেন। কেউ রোগিকে সরাসরি চিকিৎসা দিয়ে, কেউ নিরাপত্তা দিয়ে আবার কেউ খাদ্য যোগান দিয়ে নিজেকে দান করছেন। স্বপ্রণোদিত হয়ে অনেকে মানুষের প্রয়োজন মিটাতে নেমে পরেছেন পথে। মানুষের মঙ্গল করনার্থে নিজের ভোগ-বিলাসিতা বাদ দিচ্ছেন। এই সেবা ও আত্মদানের মধ্য দিয়েই আসবে বিজয়।

যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন প্রত্যেক বিশ্বাসীকে আহ্বান করে নিজ নিজ বিশ্বাস ও আশা নবায়ন করতে। কেননা যিশুর পুনরুত্থান হ'ল ঘৃণার উপর ভালবাসার সর্বোচ্চ বিজয়। পুনরুত্থিত যিশুর সংস্পর্শে এসে ভীত-সন্ত্রস্ত, হতাশ-নিরাশ ও নেতিয়ে পড়া শিষ্যেরা পেয়েছিল আশা, আনন্দ, শান্তি ও কর্মপ্রেরণা। নবোদ্যমে শিষ্যেরা পুনরুত্থিত যিশুর দয়া ও ভালবাসার কথা বলতে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা প্রতিদিনের জীবনাচরণে, কথাবার্তায় যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দান করতে পারি।

১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। নববর্ষ সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন আশা ও নতুন প্রেরণা দান করে। যেকোন মূল্যে প্রাকৃতিক করোনাভাইরাস ও মানবিক করোনাভাইরাস তথা ভেদাভেদ, মনোমালিন্য, দ্বন্দ্ব সংঘাত, অহংকার, লোভ, লালসা, দুর্নীতি ইত্যাদিকে জয় করি। শুভ পাস্কা, শুভ নববর্ষ।

মঙ্গলবাণী

তিনি উত্তরে বললেন, ওরা যে আমার প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর আমি জানি না, তাঁকে ওরা কোথায় রেখে দিয়েছে! এই কথা বলার পর তিনি ফিরে দাঁড়ালেন আর দেখতে পেলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং যিশু, তবে তিনিই যে যিশু, তিনি কিন্তু তখন বুঝতে পারলেন না। (যোহন : ২০:১৩-১৪)

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

করোনাভাইরাস সময়কাল পৃথিবীর জন্য উপবাসকাল/*বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি* - ০৬
যিশুর পুনরুত্থান মহোৎসব ঘিরে পালনীয় বাস্তব কিছু কথা/*ফাদার সুশীল লুইস* - ০৭
পুনরুত্থান: নতুন জীবনের আলো/*ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা* - ০৯
"সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন" / *ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি* -১১
খ্রিস্ট জীবিত সকলের মাঝে/ *সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ* - ১৩
পুনরুত্থিত যিশুতে জীবনযাপন/ *ফাদার নরেন জে. বৈদ্য* - ১৪
পুনরুত্থানের শক্তি/ ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি - ১৬
করোনাভাইরাস রূপান্তর হোক করুণার ভাইরাসে/*ফাদার কমল কোড়াইয়া* - ১৮
পরিবারে মানবতার গঠন, চর্চা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট:
পরিপ্রেক্ষিত ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর পরিবার/*ফেলিক্স বাবলু রোজারিও* - ২০
পাস্কা ডিম্ব!/ *ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ* - ২১
আমি উত্তম / *ভেলোরিনা সরকার* - ২২
নোভেল করোনাভাইরাসের কঠিন বাস্তবতায় এবারের পুনরুত্থান পর্ব উদ্‌যাপন /*ফাদার আলবার্ট রোজারিও* - ২৩
করোনাভাইরাস: অন্য চোখে/ *ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি* - ২৫
করোনাভাইরাসের ক্ষয়, মানবতার জয়/ *জাসিন্তা আরেং* - ২৬
সবুজ ধানের শিষের মত/ *ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা* - ২৮
পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন - সত্য, আনন্দ, রহস্য ও বিস্ময়ে ভরা / *ফাদার জেরী গমেজ, এসজে* - ২৯
সকল অশুভ তিরোহিত হোক / জ্যাষ্টিন গোমেজ - ৩২
অনলাইনে শিশু-কিশোরকে নিরাপদ রাখার কয়েকটি পরামর্শ/*নোয়েল গমেজ* - ৩৮
সাদাবিষ!/*ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও* - ৩৯

ভ্রমণ কাহিনী

যিশুর দেশে ক্রুশের পথে/*ডেভিড স্বপন রোজারিও* - ৪০
ভারত তুমি, প্রেমের তীর্থভূমি/ *ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি* - ৪২

গল্প

বৈপরীত্য/ *প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* - ৪৪
তমসার কাল / *খোকন কোড়ায়া* - ৪৬
সাদাকালো জীবন (৩) / *মালা রিবেরু (পামার)* -৪৮
গুরখুনাথ /*সাগর কোড়াইয়া* - ৪৯

স্মৃতিকথা

আঠারোগ্রামের বিয়ে অনুষ্ঠানের কথকতা/*মিলটন রোজারিও* - ৫০

ছোটদের আসর-৫৩

কলাম

প্রবাসী বিচিন্তা/ যেরোম ডি'কস্তা - ৫৪
উন্নয়ন ভাবনা/*ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি* - ৫৫

পুনরুত্থান পর্ব ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

করোনা আক্রান্ত বিশ্বে প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসব আশা ও আলো নিয়ে আসুক। মহামারীরূপ করোনাভাইরাসসহ সকল মন্দতাকে জয় করতে সচেতনভাবে জীবনযাপন করি। পুণ্যময় পুনরুত্থান ও বাংলা নববর্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম, শান্তি ও আনন্দ সবার ওপর বর্ষিক হোক। শুভ পাস্কা।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ঘোষণা

করোনাভাইরাসে সৃষ্ট কঠিন সংকটের কারণে আপনাদের কাঙ্খিত ও বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যা ছাপা আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে দুঃখিত। তবে সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমরা অনলাইনে ই-পেজ আকারে আমাদের এবারের ইস্টার সংখ্যা প্রকাশ করছি। পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্ভবপর শিঘ্র সময়ে আমরা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ইস্টার সংখ্যা ও পরবর্তী ইস্যুগুলো ছাপা আকারে প্রকাশ করব। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মহামারীরূপ করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে সরকার যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছেন তার সাথে একাত্ম হয়ে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে।

- পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

মি: সাগর এস, কোড়াইয়া অনেক দিন যাবৎ খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সাপ্তাহিক প্রতিবেশী বিভাগের বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন শাখায় কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে তিনি এ কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর অফিসিয়াল কাজে জড়িত নন। আমরা তার মঙ্গল কামনা করি।

- পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়ের

শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয়জনেরা,

পুনরুত্থানের শুভেচ্ছাবাণী লিখতে গিয়ে থেমে যাচ্ছি বারবার। কী পুনরুত্থানের বাণী, আনন্দময় বাণী আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো? পুনরুত্থান দিবস আসছে কিন্তু এই দিবস কী মুক্তি ও স্বস্থির বাণী, আনন্দের বার্তা আমাদের জন্য নিয়ে আসবে?

সারা তপস্যাকালটিতে ছিলাম আমরা বন্দী: গৃহবন্দী, বাড়ী-বন্দী, গ্রাম-শহর-দেশ-বন্দী। খ্রিস্টীয় জীবনসাধনার পরমকালটি অতিবাহিত করেছি গির্জায় যাওয়া থেকে বিরত থেকে, সংস্কার, খ্রিস্টযাগ ও পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত ছাড়া; এক অভাবনীয় কষ্টের সময়! পবিত্রতার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সময়ে তার ভক্তজনগণের সেবা করতে না পারা পুরোহিতদের জন্য ছিল অসহ্য বেদনাদায়ক। কত গরিব-দুঃখী অনাহারে, শূণ্যতায় দিন কাটাচ্ছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবাই ভীত-শঙ্কিত। আর পুণ্য সপ্তাহে গোটা বিশ্ব ভোগ করেছে জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা, দুঃখ-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা। অনুভব করেছ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রিয়জনেরা পাশে-না-থাকার একাকীত্বের চরম বেদনা এবং পরিসমাপ্তিতে নিগৃহীত হয়ে নিরবে মৃত্যবরণ করা। যিশুর জীবনের শেষে নিজে কিছু না করে, তাঁর প্রতি সবকিছু করা হয়েছে, তিনি সবকিছু ভোগ করেছেন। এ ব্যাপারে আমরাও যাতনা-ভোগ করার সময় আমরা কাটিয়েছি।

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে, ঐসব ভাবনায়, প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তে পরস্পরের সাথে আমরা একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছি। অসাধারণভাবে পরস্পরের পাশে দাঁড়াবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। উপবাসকালে যিশুর অনেক কাছে আসার ও কাছে থাকার সুযোগ আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের যাতনাভোগের যাত্রায় আপনারা বিশ্বস্ত ছিলেন খ্রিস্টযিশুতে, তাঁর সাথে পথ চলেছেন। দেশ, সমাজ ও জগতের পরিস্থিতিতে আপনারা বিশ্বাসী, আগ্রহী, ধর্মের জন্য পিপাসিত হয়ে, পরিবারে সকলে এক হয়ে বিশ্বাসের পথ চলেছেন। গোটা বিশ্ব সবাই মিলে "এক" হওয়ার অভিজ্ঞতা পেয়েছে। আর এখানেই আপনাদের কাছে পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা জানানোর কারণ ও সাহস খুঁজে পাচ্ছি।

আসলে পুনরুত্থান হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, পুনরুত্থান হচ্ছে আমাদের আশা। সেই বিশ্বাসে ও আশায় আমরা জীবন যাপন করছি। করোনার দুর্যোগে মৃত্যুসামিল অবস্থা, গুহার অন্ধকার, কবর থেকে বের হবার বিশ্বাস ও আশা আমাদের আছে। তবে সেই পুনরুত্থান দিবস কোন্‌দিন হবে আমরা সঠিক করে কেউ বলতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করতে পারি, আশা করতে পারি যে, যীশুর পুনরুত্থানের সহভাগী আমরা একদিন হতে পারব। সেই বিশ্বাস ও আশায় আমরা পথ চলি, এবং বলি "যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন"। সেই পুনরুত্থানে আমরা বিশ্বাসী ও প্রত্যাশী।

পুনরুত্থানের সময় যিশুর শিষ্যেরা যেমন যিশুর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হয়ে ও আশান্বিত হয়ে জীবনযাপন করেছিলেন, পবিত্র আত্মার অবতরণ প্রত্যাশায় ও শক্তিতে আমরাও সবাই যেন সেরূপ জীবনযাপন করতে পারি সেই আশীর্বাদ পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর কাছ থেকে কামনা করি।

আপনাদের সাথে একাত্মতায় ও আশীর্বাদান্তে,

+ পাত্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি.

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

ঢাকার আর্চবিশপ।

করোনাভাইরাস সময়কাল পৃথিবীর জন্য উপবাসকাল

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

রবিবারে খ্রিষ্টযাগ উপাসনায় আমরা একমাথে মিলিত হই ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় এবং সবাই মিলে খ্রিষ্টপ্রসাদে গ্রহণ করি যিশুকে। খ্রিষ্টযাগ উপাসনার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, " আমরা যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্মিলিত হয়ে এক হতে পারি।" তাই রবিবারে খ্রিষ্টযাগ প্রার্থনায় একসাথে বাহ্যিক দিক থেকে যেমন তেমনি অন্তরের ও আত্মিক দিক থেকে মিলিত হওয়া এবং তার ফলে এক হওয়া সবিশেষ প্রধান বিষয়।

সবাই সবার জন্য জীবনদায়ী খাদ্য ও পানীয় হওয়াঃ

প্রায়শ্চিত্তকালের পঞ্চম রবিবারের সুসমাচারে মৃত লাজারকে পুনরুত্থিত করার বিষয়টি আমাদের ধ্যানের জন্য দেয়া হয়েছিল। আশ্চর্য কাজটির দ্বারা যিশু দেখালেন যে পৃথিবীতেই আমাদের এই জীবন অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে, মৃত্যুতে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য নয়। পৃথিবীর জীবন জীবিত থাকারই জন্যে; তাই যিশু মানুষকে অসুস্থতা থেকে সুস্থ করেছেন; আমরাও সুস্থ থাকতে চেষ্টা করি সর্বদা, যেন জীবনের পুনরুত্থান অবধি সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে পারি।

তবে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির জীবন সবিশেষ মানব জীবন অতিশয় আশ্চর্য বিষয়, কেননা তা শেষে বর্তমান আকার থেকে চলে যায়, সমাপ্ত হয়; তবে তা অনন্তকালীন জীবনের আকারে উত্তীর্ণ হয়, ইহ জীবনটি সবার জন্য জীবনদায়ী "খাদ্য ও পানীয়" রূপে দান করে দিয়ে অনন্তকালীন জীবনে উত্তরিত হয়; তাতেই জীবনের পুনরুত্থান ও অনন্তকাল।

যিশু নিজেই ক্রুশ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইহ জীবনের আকার থেকে চলে গিয়ে সবার জন্য অনন্ত জীবনের "খাদ্য ও পানীয়" রূপে দান করলেন, এবং খ্রিস্টপ্রসাদে তা চিহ্ন ও আশ্চর্যময় বাস্তবতা রূপে রেখে গেলেন। আমরা তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করি; আর শিক্ষা নেই, যেন আমাদের জীবনও সবার জন্য প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও দয়ায় "খাদ্য ও পানীয়" রূপে দান করি।

বস্তুত পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্টির ও মানব জীবনের আসল রহস্য হল যে, তা অন্যের জন্য জীবনদায়ী "খাদ্য ও পানীয়" হয়ে চলে গিয়ে অনন্তকালীন হয়ে থেকে যায়। মানবেরই নিজের দৈহিক ও আত্মিক জীবন সৃষ্টির জল, বায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্য মানবের উপর সদা নির্ভরশীল। কে অন্যের জীবন থেকে "খাদ্য ও পানীয়" গ্রহণ না করে মুহূর্ত মাত্র বাঁচতে পারে? অতি আবশ্যকীয়ভাবেই আমরা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবার জীবনের কাছে নির্ভরশীল। তাই আমরা যেন কখনও অযোগ্যভাবে কারও জীবনের দান গ্রহণ না করি। আমরা কখনও কারো জীবন ধ্বংস করার মত ব্যবহার করতে পারি; কিন্তু নিশ্চয়ই আমি ঐ জীবনটিতে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য নষ্ট করতে পারি না। আমি কাউকে ধ্বংস করলেও সে তার হৃদয়ে তার জীবনসত্তাকে উদ্ধার করে নিয়ে নিজেকে অন্যের জন্য 'খাদ্য ও পানীয়" রূপে দান করেই বিলীন হয় অনন্তকালে। পৃথিবীতে সকল বস্তু, জল-বায়ু-ভুমি, উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং মানব জীবন সবার জীবনের আহ্বান অন্যের জন্য জীবনদায়ী "খাদ্য ও পানীয়" হয়ে অনন্ত জীবন হওয়া। তা সঠিক থাকলে কোন কিছুই দূষণ বা ভাইরাস হয় না।

দূরে থেকে ও কাছে এসে 'এক' হওয়া

বর্তমান সময়ে ভয়ংকর করোনাভাইরাসের ছোঁয়াছে এসে সংক্রমিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে আমরা সর্বত্রই সমাবেশে মিলিত হওয়া একেবারেই বর্জন করে চলছি; আর শুধুমাত্র আপন জনদের মাঝে এবং একান্ত প্রয়োজনে খুবই সীমিত সংখ্যায় অন্যদের সাথে তবুও মাঝামাঝি দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারছি। এই পরিস্থিতিতে আবার ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে দূরের মানুষের সাথে এক হতেও পারছি।

এভাবে বাধ্যতামূলক সীমিত আকারে মাত্র একত্রিত হওয়া কাম্য বিষয় নয়, যথেষ্ট কঠিন বৈকি। তবে এই কঠিনতার মাঝে "একত্রিত, মিলিত ও এক" হওয়ার একটি সংযম বা শুভ পরিশ্রমের দিকও আছে। কোলাকুলি করে কাছে থাকার নির্ধারিত কারণ ও সময় থাকে; আবার অযথা গায়ে পড়ে গিয়ে কাছে হওয়ার মধ্যে মাধুর্যের চেয়ে অমাধুর্যই বেশী; অতি কাছের মানুষের সাথেই একটা সান্নিধ্যসুলভ ফাঁক রেখে কাছে থাকাই স্বাভাবিকভাবে সুন্দর ও আরামদায়ক। আমরা বরাবরই খুব কাছে থেকেও বহু দূরেই যে থাকি; এখন বাহ্যিকভাবে কিছু দূরে অবস্থান নিয়ে অন্তরে কাছে থাকার অনুশীলন করতে পারছি।

করোনাভাইরাস সময়টি জগতের জন্য উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত কাল

প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের জন্য আত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ পবিত্র কাল, কেননা সময়টি আমাদের জন্য দেহ-মন-আত্মায় পরিশুদ্ধ হওয়ার সময়; দূষণমুক্ত হওয়ার সময়, শুদ্ধিকরণের সময়।

পৃথিবীতে বর্তমান মহামারীতুল্য করোনাভাইরাস পৃথিবীর এক কঠিন ও ঘনীভূত দূষণের কথাই বলে। তাই বর্তমান সময়টি গোটা পৃথিবীর জন্য সবিশেষ প্রায়শ্চিত্তকাল স্বরূপ, উপবাসকাল স্বরূপ; বাহ্যিকভাবে ও অন্তরের দিক থেকে দূষণমুক্ত হওয়ার বিশেষ সময়। অশুভ বেদনাপূর্ণ একটি সময় বটে; তবে তা অযথা না হোক; বরং সংযম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বাহিরের ও অন্তরের শুদ্ধিকরণের ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য সবিশেষ দৃঢ়তার সময় হোক।

তিনটি ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ প্রার্থনা-উপবাস-দয়ার মাধ্যমে আমরা দেহ-মন-আত্মায় শুদ্ধিকৃত হয়ে পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করি। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া -- তিনটিই উপবাস স্বরূপ; তাই তিনটিই দৈহিক ও আত্মিক জীবনের দৃঢ় শুভ সংযম ও পরিশ্রম, যেন আমরা দূষণমুক্ত হই। যিশু বলেন, তোমরা যখন উপবাস কর বিষন্ন হইও না, বরং মুখম-লে উজ্জ্বলতা লাভ কর। নিশ্চয়ই তা নিছক গান-বাজনার উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা নয়; বরং উপবাসের ফল স্বরূপ পবিত্র প্রার্থনা ও দয়ায় সমস্ত মানুষকে দেহ-মন-অন্তরে ভক্তির আবেগে বরণ করে নেয়ায় আমাদের দেহ-মন-আত্মা উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হয়।

করোনাভাইরাস সময়কালে আমাদের সকল দুঃখ-বেদনা জীবনের উপবাস স্বরূপ হোক। নিকটে-দূরে অনেকের প্রতি হিংসা-ঘৃণা-অপমানের যুদ্ধ সাধনা ও আচরণের দুর্গন্ধ দূষণ থেকে কঠিন উপবাস সাধনা ও আচরণ যে প্রয়োজন, তখনই জগৎ ও মানব কৃষ্টিতে আসে সবার মঙ্গল কামনায় অন্তরে পবিত্র প্রার্থনা; আর পরস্পরের প্রতি মঙ্গল কাজের আচরণে সৃষ্টি হয় দয়ার সভ্যতা।

তৃতীয় সহস্রাব্দে পৃথিবীর মানব কি ভাইরাসতুল্য যুদ্ধ সাধনা ও আচরণ পরিহার করে বিপরীতমুখী শুভ সাধনা ও আচরণের চেতনায় আসতে পারবে না? পরস্পরের প্রতি মঙ্গল কামনার সাধনা ও আচরণের প্রার্থনায় ও দয়ায় মগ্ন হতে পারবে না? বর্তমান ভয়ংকর ভাইরাস দূষণ থেকে উপবাস কালের সেই আহ্বান আমাদের সামনে আগত হয়েছিল। এসো এই উপবাস গ্রহণ করি॥ ❑

যিশুর পুনরুত্থান মহোৎসব ঘিরে পালনীয় বাস্তব কিছু কথা

ফাদার সুশীল লুইস

আমাদের জন্য পাস্কা হল জীবনের পর্ব, বসন্তের পর্ব, পর্বের পর্ব, মহাপর্ব, পর্বের মাতা, 'মহা রবিবার', 'মহোৎসবের মহোৎসব'। আর সেদিক থেকে পাস্কা হলো মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় পার্বণ যদিও বিভিন্ন বাস্তবতায় খ্রিস্টভক্তগণ এটিকে ঘিরে ততো বেশি প্রস্তুতি নেন না, সাজগোজ ও উৎসব করেন না। তারপরও নানাভাবে গুরুত্ব দিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে আমরা যিশুর পুনরুত্থান উদ্‌যাপন করি এবং তাঁর বিজয়ানন্দে মেতে উঠি। সেদিক থেকে অবশ্যই এই পার্বণটি উদযাপনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব, সচেতনতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমরা প্রতিবছর কমবেশী ঘটা করে পাস্কা মহাপর্ব পালন করে থাকি। পুনরুত্থান হল নব জীবনে, নতুনত্বে পার হয়ে যাওয়ার উৎসব। এর মাধ্যমে আমরা যিশুর জীবন ও মুক্তি লাভ ক'রে ঈশ্বরের স্বাধীন সন্তান হিসাবে পরিগণিত হই। এ সময় জীবনের নতুনত্বে যেতে তা উপলব্ধি ও উদ্‌যাপন করতে প্রত্যেকেরই জীবন গভীরে অনেক কিছু করার ডাক ও দায়িত্ব থাকে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ১০৬৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "উপাসনা-অনুষ্ঠানের মধ্যে খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বোপরি উদ্‌যাপন করে নিস্তার-রহস্য যার মাধ্যমে খ্রিস্ট আমাদের পরিত্রাণকার্য সম্পাদন করেন।" নিম্নলিখিত দিকগুলোর দিকে নজর রাখলে পাস্কা মহোৎসব ভিতরে-বাহিরে জাঁকজমকপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠতে পারে।

১) পাস্কা হতে পারে তাজা লতাপাতা ও ফুলের উৎসব। তাই সবুজ লতাপাতা ও তাজা ফুল দিয়ে ঘরবাড়ী গির্জা, পাস্কার মোমবাতি সাজানো এবং জীবনকে সেভাবে সজীব, সতেজ রাখা প্রত্যেকেরই দরকার। সেভাবে সমাজে পরিবারে ও মণ্ডলীতে আনন্দ, সক্রিয়তা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিরাজ করবে।

পাস্কা হল জীবনের উৎসব, নতুনত্বের উদ্‌যাপন, এসময় আমরা যিশুর নব জীবনে পূর্ণ হয়ে প্রত্যেকের জীবনকে প্রাণের স্পন্দনে, সবুজের সমারোহে ভরিয়ে তুলি। কথায়, কাজে জীবনাচরণে, চালচলনে, ধর্ম কর্ম, বিশ্বাসে, চিন্তা চেতনায়, শিক্ষায়, আদর্শে, প্রাণের বসন্তে সবাই নতুন হই, সজীব ও পূর্ণ হই। পাস্কা হল যিশুর পুনরুত্থিত জীবন উদ্‌যাপন আর সেভাবে জীবনের স্পন্দনে সবলে পথ চলা, কথা বলা ও কাজ করা-নতুন হওয়া। পাস্কা উপলক্ষে বিবেচনার, সাজানোর ও করার কিছু দিক থাকে। আর এসব মানুষের জীবনে যিশুর পুনরুত্থান বেশী বাস্তব ও শক্তিশালী করতে পারে।

২) বেদীর পিছনে দেয়াল বিভিন্ন রঙের কাপড়, লেখা বা ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে সেখানকার কেন্দ্র যে ক্রুশ সেটা যেন কোনভাবেই ঢাকা না পড়ে। ক্রুশের অংশ ফাঁকা রেখে রুচিশীল ও মার্জিতভাবে সাজিয়ে বেদীর পিছনের অংশের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে। ক্রুশের প্রতি দৃষ্টি মানুষের জীবনকে যিশুর মৃত্যু পুনরুত্থানের অনেক গভীরতায় নিয়ে যেতে পারে।

৩) বেদী হচ্ছে খ্রিষ্টযাগের কেন্দ্রবিন্দু। এটি হল যিশুর ও তাঁর উৎসর্গের চিহ্ন। তাই এটি সুন্দর ক'রে সাজালে মানুষের মনোযোগ সেদিকে নিবিষ্ট থাকে। যে কোন পর্বে বেদী সাজানো হয় তবে পাস্কা পর্বে গুরুত্বসহ তা সাজালে এক মহার্থ বহন করে। আর তা হল যিশুর জীবন ও পুনরুত্থান। এজন্য সে বিষয়ের উপর নজর রেখে বেদীর সাজসজ্জা করলে, উপকরণ রাখলে পাস্কা অনুষ্ঠান জাঁক-জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ হতে পারে। আর তা মানুষদের স্ব স্ব হৃদয়ে পুনরুত্থান উদ্‌যাপন করতে সহায়তা ও পরিচালনা করতে পারে।

ক-পাস্কা মহাপার্বণের উপাসনায় ব্যবহৃত রং হচ্ছে সাদা, যা আনন্দের প্রতীক। এটি মানব নির্মলতা ও জীবনের পবিত্রতাকেই বার বার প্রকাশ করে। রোমীয়দের কাছে এটি উৎসব, আনন্দ ও রাজকীয় ভাব প্রকাশ করতো। আমাদের দেশের বাস্তবতা অনুসারে এটি বার বার হৃদয় ও জীবনের পবিত্রতা, নির্মলতা ও নিবেদনের ইঙ্গিত দেয়। তাই সাদা কাপড় দিয়ে কারুকার্য ক'রে বেদী সাজালে পাস্কার প্রকৃত ভাবার্থ ও সৌন্দর্য আমাদের কাছে ধরা দিবে। পৌরহিত্যকারী ঐদিন সাদা বা সোনালী পোশাক পরিধান করেন।

খ-বেদীতে বা উপযুক্ত অন্য কোন স্থানে 'খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন' এ ধরনের কোন বাক্য সুন্দর ক'রে লিখে উপাসনালয়ের সৌন্দর্য বর্ধন করা যেতে পারে। সাথে সাথে উপাসনার মর্মার্থও ফুটিয়ে তোলা যায়। বিভিন্ন ফুলের সমন্বয়ে ফুলদানী তৈরী ক'রে বেদীতে বা বেদীর পাশে সাজানো যেতে পারে। তবে বেদীতে ফুলদানী প্রধান নয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে খ্রিস্টযাগে ফুলদানী একদিকে যেন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আর অন্যদিকে ভক্তদের যেন বিঘ্ন/ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। ফুলের সৌন্দর্য, সুবাস ও সজীবতা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সুবাসিত করতে অনুপ্রেরণা দিতে পারে।

গ-বেদীর উপরে বা দু'পাশে মোমবাতি বা তেলের প্রদীপ ব্যবহার করা যাবে। পুনরুত্থানে মহোৎসবে মোট ৬টি বাতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাতি কোন মতেই খ্রিস্টযাগে ভক্তদের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

৪) উপাসনালয় সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সমস্ত উপকরণ যথাস্থানে পরিপাটি ক'রে রাখা যিশুর পুনরুত্থান উপাসনায় আমাদের সহায়ক হতে পারে। উপাসনায় কাল ও ভাব অনুসারে উপযুক্ত-গান-বাজনা, কথা, সার্বিক সাজসজ্জা, পরিবেশ প্রভৃতি যিশুর পুনরুত্থানে নিমগ্ন হতে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

৫) পুণ্য বৃহস্পতিবার হাত পা ধোবার সময়ে বা আগে, পরে যিশুর সেবার দৃষ্টান্ত, পা ধুইয়ে দেবার শিক্ষা স্মরণ করা ও সে অনুসারে কাজ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন প্রতিবেশী মানুষকে সেভাবে সেবা করতে হবে, ভালবাসতে হবে। জীবনে পা ধুইয়ে দেবার, সেবা করার, ভালবাসার শত শত সুযোগ রয়েছে। সেসব সুযোগ বার বার উত্তমরূপে ব্যবহার করা প্রত্যেকের দীক্ষার দায়িত্ব ও ডাক।

৬) প্রত্যেকে নিজের নিজের যাজকত্ব এদিনে উদ্‌যাপন করব ও সেজন্য আনন্দিত মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। এদিনে নিজেদের সকল পর্যায়ের যাজকদের স্মরণ করা তাদের জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, প্রার্থনা করা দরকার। যেন তারা ভাল থাকেন ও যিশুর মত প্রেমপূর্ণ সেবাকাজ করতে পারেন। আমরা নিজেরাও নিজেদের যাজকত্ব অনুশীলন করি; জীবন নৈবেদ্য যাজকদের সাথে উৎসর্গ করি প্রতিদিন।

৭) উপযুক্ত পাপস্বীকার ক'রে বিশ্বাস ভক্তির সঙ্গে এদিন ও একালে বার বার পবিত্র কম্যুনিয়ন গ্রহণ করা সবার দায়িত্ব। অন্যদের তা গ্রহণ করতে, ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে উৎসাহিত করব। একই সাথে পবিত্র সাক্রামেন্তের প্রার্থনায়/আরাধনায় আন্তরিকতায় অংশ নেব, সাক্রামেন্তের প্রতি ভক্তি দেখাব, উপযুক্ত শ্রদ্ধায় তা গ্রহণ করব, তা অতিক্রম করার সময়ে ভক্তিযুক্ত প্রণাম করব। উপাসনালয়ে প্রবেশ করব, নীরব থাকব ও উপাসনায় সক্রিয়, সচেতন ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করব।

৮) আশীর্বাদিত নতুন তেল নিয়ে পূণ্য বৃহস্পতিবারে উৎসর্গ শোভাযাত্রা করি এবং সে সঙ্গে অভাবী মানুষকে দেবার জন্য যার যার সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেকে নিয়ে আসি দয়া-ভালবাসার দান-অর্ঘ্য সমাগ্রী। আর সেসব দয়ার দান মানুষের মধ্যে বিতরণ ক'রে পাস্কার আনন্দ বাড়িয়ে তুলি বহুগুণ।

৯) যিশুর মৃত্যু রহস্য বুঝতে চেষ্টা করব। ক্রুশকে সম্মান করব, বার বার সবাই ক্রুশের দিকে তাকাব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। জীবনে অনেক ক্রুশ আসে সেসব একা পরিবারে ও সমবেতভাবে বহন করব আর যিশুর সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলব। হতাশা, নিরাশা, একাকীত্ব, দুঃখ এগুলি হল ক্রুশ-এসব জয় করতে যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকব। তাঁর শক্তি নিয়ে আশায়, সাহসে, ভালবাসায় পথ চলব।

ক- জীবনের পুণ্য শুক্রবারের দুঃখ, মৃত্যু, শূন্যতা, কষ্ট, একাকীত্ব, নিরাশা দূর হোক আর আসুক পাস্কা সকাল ও দিনের জীবন ও আনন্দ, ভালবাসা, গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষমা আর এভাবে যিশুর পুনরুত্থানের পূর্ণতা আসুক প্রত্যেকের জীবনে ও সমস্ত কিছুতে।

খ-ঘরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবারে একটি ক্রুশের সামনে সকলে দাঁড়ানো ও একত্রে একটু সময় সবার মঙ্গলে প্রার্থনা করা সুফল আনতে পারে। আর এভাবে আমরা যিশুর মৃত্যু পুনরুত্থান নিজ জীবনে উপলব্ধি করতে পারবো। নিজের পরিবারে একটি ক্রুশ না থাকলে এ পাস্কায় একটি ক্রুশ সংগ্রহ করি ও এমন কেন্দ্রীয় স্থানে রাখি যা সবাই সব সময় ও সহজে দেখতে পায়; ক্রুশ ভক্তি দেখিয়ে বাইরে যেতে পারে এবং বাইরে থেকে এসে তা সম্মান করতে পারে।

গ-ঘরে গিয়ে সবাই ক্রুশের সামনে একটি বাতি জ্বালানো ও তার সামনে দাঁড়িয়ে একটু প্রার্থনা করা অনেক মঙ্গল আনতে পারে।

১০) পরিবারে পবিত্র খেজুর পাতা, পাস্কার আশীর্বাদিত জল, পাস্কায় ব্যবহৃত মোমবাতি যত্ন করে ঘরে রেখে দিই এবং ভাল-মন্দ বিভিন্ন উপলক্ষে সেসব ব্যবহার করি, সেসব ঘিরে পাস্কার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তৎপর হই।

১১) পুনরুত্থান প্রদীপটি রাখা হয় বেদীর কাছে উপযুক্ত স্থানে। বাতিটি রাখার জন্য সুন্দর একটি বড় বাতিদানী ব্যবহার করা যেতে পারে। বাতিদানীটি শুকনা জিনিসের পরিবর্তে বার বার নানা প্রকার তাজা ফুল ও সবুজ লতাপাতা দিয়ে সাজালে জীবন্ত যিশুর এক পরিস্কার প্রকাশ হবে। এটিকে ঘিরে কখনও কখনও আনন্দগান করা যেতে পারে, লেখা দেয়া যেতে পারে। এটি প্রকাশ করে যিশু মহা গৌরবে পুনরুত্থিত, জীবিত, তাঁর মহিমা জ্যোতি আমাদের মন ও প্রাণের সমস্ত অন্ধকার দূর করে।

ক-পুনরুত্থান প্রদীপের ক্রুশের চিহ্ন ও পাঁচটি ধূপ-শলাকা প্রকাশ করে যিশুর পঞ্চক্ষতে আমাদের বিশ্বাস, মুক্তি। পুনরুত্থান প্রদীপে চিহ্নিত লেখা গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আলফা ও শেষ অক্ষর ওমেগা (যাদের অর্থ আদি ও অন্ত) প্রকাশ করে মৃত্যু-বিজয়ী খ্রিস্ট সব সময়ের প্রভু, বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে অস্তিত্বমান সব কিছুর উর্ধ্বে, সমস্ত রাজত্ব, প্রভুত্ব, ক্ষমতা ও গরিমা তাঁরই। সৃষ্টির শুরু থেকেই তিনি প্রতিটি মানুষের প্রভু। আমরা যেন একথাগুলি আমাদের অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে খ্রিস্ট আমাদের জ্যোর্তিময় মুক্তিদাতা।

খ-উপাসনালয়ে জীবিত যিশুর চিহ্ন পুনরুত্থান বাতির দিকে সবাই একত্রে, ব্যক্তিগতভাবে বার বার তাকাই। আশা, ভরসা ও ভালবাসায় বার বার সে দিকে সবার হাত বাড়ানো অনেক চেতনা ও সাহস দিতে পারে, নতুন জীবনে চলার আলো দিতে পারে।

১২) নব আশীর্বাদিত দীক্ষা জলের পাত্রটি বেদীর কাছে উপযুক্ত স্থানে রাখা হয়। অবশ্য কোথাও কোথাও তা বাঁ পাশে রাখা হয়। পাত্রটি রাখার জন্য সুন্দর একটি ছোট স্থান প্রস্তুত করলে ভাল হয়। স্থানটি বিভিন্ন রঙের কাপড়, ছবি ও লেখা (জীবন জল) দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে।

ক-পাস্কা মহাপর্ব দীক্ষার অর্থকে পরিস্কার করে। খ্রিস্টের পুনরুত্থানেই আমাদের মুক্তি, বিশ্বাসী জীবন। সুতরাং পাস্কায় দীক্ষাপ্রার্থী দীক্ষাজলে নবীকৃত হয়ে নতুন জন্ম লাভ করে। দীক্ষাজলের পাত্র সামনে দেখে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের দীক্ষা, দীক্ষার স্থান, তারিখ প্রভৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করি, ঈশ্বরকে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সুযোগ, সম্ভাবনা ও সময় থাকলে আমাদের সন্তান ও প্রিয়জনদের পাস্কারাতে, পাস্কার দিন বা পাস্কাকালে দীক্ষা দেবার সকল ব্যবস্থা করি।

১৩) পরিবারে যিশুর পুনরুত্থানের ছবি বা মূর্তি থাকলে তা উপযুক্ত স্থানে রেখে সেখানে বাতি জ্বালাই, ফুল সাজাই ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করি; পুনরুত্থানে অনুপ্রাণিত হয়ে ছেলেমেয়েদের সে বিষয়ে শিক্ষা দিই।

১৪) খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন তার প্রতীক স্বরূপ বেদী থেকে কয়েক হাত দূরে একটি শূণ্য কবর তৈরী করা যেতে পারে। এতে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে পুনরুত্থানের অর্থ আরো পরিস্কার হতে পারে।

১৫) মানুষ জীবনে যেখানে পড়ে আছে, যেখানে আশাহীন সেখান থেকে প্রত্যেকে আবার উঠে দাঁড়াক, নতুন চলার শক্তি লাভ করুক সেই তো পুনরুত্থান, সেই তো নবজীবন। এভাবেই বার বার আমরা বুঝি পুনরায় উঠা হল পুনরুত্থান। আমাদের প্রত্যেককে উঠে যিশুর পথে চলতে হবে। সেই তো বিশ্বাসের জীবন, প্রত্যাশার জীবন, আলোর জীবন।

১৬) আমরা সবাই যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী-শিষ্য। আমরা তাই পুনরুত্থান পালন করে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। কবর থেকে যেভাবে স্বর্গদূত নির্দেশ দেন আমাদের সেভাবে সর্বত্র ও সবার কাছে যিশুর পুনরুত্থানের মহাসংবাদ জানাতে হবে। যিশু পুনরুত্থিত, জীবিত। আল্লেলুইয়া! নানা উপলক্ষে বার বার সানন্দে বলি আল্লেলুইয়া! প্রভুর প্রশংসা হোক- প্রভুর জয় হোক, যিশু জীবিত, এসব আনন্দ বাণীতে ভরিয়ে তুলি সবার জীবন। সর্বত্র, সবাইকে সেই আনন্দের সহভাগী করি। সেভাবে সকলে আমরা যিশুর পুনরুত্থানে আনন্দ করি অন্যের কাছে আনন্দের সুসংবাদ, গান নিয়ে যাই। আর অনেকে তখন যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ উপলব্ধি ক'রে যিশুকে জীবন সাথী করে সাহসে পথ চলতে পারবে।

১৭) পাস্কায় আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রায়ই বলি : "হেপি ইস্টার" ! এ শব্দ পাস্কার সত্যিকার অর্থ ও ধারণা প্রকাশ করে না, ইংরেজির অনুকরণে শুধু শব্দ প্রকাশ করে। তাই আমরা "শুভ পাস্কা" বলতে অনুপ্রাণিত ও অভ্যস্ত হই !

শেষে বলা যায় যে, পাস্কা হল আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মূল পর্ব আর এ উপলক্ষে সাজসজ্জা, প্রস্তুতি, সচেতনতা বড়দিনের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসবের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর পাস্কার উপাসনা অর্থপূর্ণ ও ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ সাজ-সজ্জা পাস্কা পর্বে উৎসব ও আমেজের ভাব বৃদ্ধি করে এবং উপাসনায় মানুষের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বাড়াতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে পাস্কা বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা ভক্তদের পাস্কার গভীর মর্মার্থ বুঝতে অনুপ্রাণিত করে। যিশু প্রতিদিনের জীবনের পুনরুত্থান সূর্য: জীবন থেকে রাতের অন্ধকার, ভয়, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, সংকট, সন্দেহ প্রভৃতি দূর হোক যেভাবে নতুন সূর্যের আগমনে এসব দূর হয়। এভাবে পুনরুত্থানস্বরূপ নতুন সূর্যের উত্থানে আমাদের জীবনে আসুক নতুন সকাল, আশা ভরসায় পূর্ণ ঝলমলে পুনরুত্থান প্রভাত। প্রভু আমাদের সেই পূর্ণতায় পরিচালনা করুন, ঘিরে রাখুন। যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে সবার অংশগ্রহণের পথ আরো বাস্তব ও উপযোগী হোক। পাস্কা সবার জীবনে নতুনত্ব ও নতুন জীবন আনুক। শুভ পাস্কা। শুভ পাস্কা! ❑

পুনরুত্থান: নতুন জীবনের আলো

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

পুনরুত্থান হল নতুন জীবনের উত্থান। খ্রিস্ট সত্যই পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া। খ্রিস্টীয় জীবনের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল খ্রিস্ট যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছেন। আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। সেই সাথে আমরা এইও বিশ্বাস করি আমরাও একদিন পুনরুত্থিত হব। পুনরুত্থান শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে নতুন জীবন পাওয়া বা লাভ করা নয়। এই পুনরুত্থান হল পুনরায় জীবনের উত্থান। আমাদের জীবনে যে কোন সময় পুনরুত্থান ঘটতে পারে। যখন আমাদের জীবনে পুনরুত্থান বা উত্থান ঘটে তখনই আমাদের জীবনে নতুন করে আলো ফুটে উঠে। তপস্যাকালে আমরা ক্রুশের পথে যাত্রা করেছি। ত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করেছি যেন নতুন জীবনের আলো লাভ করতে পারি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় সিক্ত হয়ে আমরা প্রত্যেকে যেন জীবন পথে এগিয়ে চলতে পারি।

খ্রিস্ট যে পুনরুত্থিত হয়েছেন তা স্বর্গীয় দূতদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। "তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল পোশাক পড়া কারা দু'জন। তখন তারা ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন; মাটির দিকে মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। তখন সেই দু'জন তাঁদের বললেনঃ "যিনি জীবিতই আছেন, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?... তিনি এখানে নেই; তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন *(লুক ২৪ঃ৪-৫)*।"

"তিনি তাদের বলেনঃ "তোমরা ভয় পেয়ো না! তোমরা তো নাজারেথের যিশুকেই খুঁজছ, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল! তিনি কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই। এই দেখ, তাঁকে এইখানেই রাখা হয়েছিল *(মার্ক ৬-৭)*!" যিশু যে পুনরুত্থিত হয়েছেন এটা ঐতিহাসিক সত্য। ঐতিহাসিক সত্য হলো সেটা যে বিষয়টা ইতিহাসের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যিশু যে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তার প্রমাণ হল শূন্য সমাধি, কাপড়ের ফালি, স্বর্গদূতদের সাক্ষ্য ও পাথর সরান অবস্থায় থাকা। তাছাড়া পুনরুত্থিত খ্রিস্ট শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। শিষ্যেরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে অভিজ্ঞতা করেছেন এবং সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল তারা জীবনে নতুন আলো লাভ করে সাহসী হয়ে উঠল। তারা ঘর ছেড়ে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলো জীবনে লাভ করার পরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন আমার জন্যে, আমাদের সকলের জন্যে। আমরা সকলে যেন পুনরুত্থিত হতে পারি। সেই আলো অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি। এই পুনরুত্থান উৎসব হল পাথর সরানোর উৎসব। কবরের মধ্যে পাথর সরানো অবস্থায় ছিল। পাথর দিয়ে যখন কোন কিছু ঢাকা থাকে তখন কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। যখন পাথর সরানো হয় তখন মাত্র মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যেও অনেক ছোট বড় পাথর রয়েছে এগুলো যেন আমরা সরাতে পারি। অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, অন্যকে ঘৃণা করার প্রবণতা, মিথ্যা কথা বলা, পরশ্রীকাতরতা, সমালোচনা, অন্যের ভাল না দেখা, অন্যের অমঙ্গল কামনা করা ইত্যাদি হল আমাদের জীবনের এক একটা পাথর। যখন পাথর আমাদের জীবনে থাকে তখন বোঝা অনেক ভারি মনে হয়। তখন জীবনে আমরা সুন্দর ভাবে চলতে পারি না। হোঁচট খাই। খ্রিস্টের আলোও তখন অমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। এই আলো প্রবেশ করাতে হলে এ সকল পাথর সরাতে হয়। যখন আমরা পাথর সরাতে পারি তখন আমাদের জীবনে খ্রিস্টের আলো প্রবেশ করতে পারে। আমরা নতুন মানুষে রুপান্তরিত হতে পারি। তাই ব্যক্তি জীবনে আমাদের সচেতন থাকতে হয়। যখন সচেতন থাকি তখন আমাদের জীবনের পাথর আমরা সরাতে পারি। খ্রিস্টের আলোর মধ্য দিয়ে জীবনকে ভরিয়ে তুলতে পারি।

খ্রিস্ট মৃত্যু বরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন আমার জন্যে কিন্তু অনেক সময় সেই কথা আমরা ভুলে যাই। যখন সেই কথা ভুলে যাই তখন আমরা আলোর পরিবর্তে অন্ধকারে বসবাস করি। আমরা আলোর মানুষ। আমরা যেন সেই অন্ধকার থেকে বেরিতে এসে সত্যের আলোতে সর্বদা আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। কারণ যিশুই হলেন-"পথ, সত্য ও জীবন *(যোহন ১৪ঃ৬)*।" তাঁর মধ্য দিয়ে পথ চললে আমরা জীবনের দিকে পথ চলতে পারব। অন্যদের ও জীবনের সন্ধান দিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান হল জীবন অর্থাৎ নব জীবনের দিকে পথ চলার আহ্বান। আমি কোন দিকে পথ চলব সেটা অন্যের উপর নয় নিজের উপর নির্ভর করে। আমি যেন আমার আমিত্বকে চূর্ণ করে নব জীবনের আলোর মধ্য দিয়ে পথ চলি। যিশুকে অনুসরণ করি।

এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনেক বার পুনরুত্থানের আলো আসতে পারে। পুনরুত্থান হল নতুন জীবনের সন্ধান লাভ। যখন আমরা দৈনন্দিন জীবনে পথ চলি তখন অনেক বার বিপদের মধ্যে পতিত হই। অনেক ক্ষেত্রে আশার পরিবর্তে নিরাশা আমাদের মধ্যে ভর করে। এই নিরাশা, বিপদ-আপদ, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, ঝড়-ঝঞ্ঝা এগুলো হল আমাদের জীবনে এক একটা অন্ধকারময় অবস্থা। এখান থেকে আমরা যখন উদ্ধার পাই তখন আমাদের জীবনে পুনরুত্থান ঘটে। পুনরুত্থানের নতুন আলো আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। আমরা পুনরায় নতুন করে পথ চলার জন্যে জীবন লাভ করি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এ ধরনের পুনরুত্থান একাধিকবার ঘটে থাকে। এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা পুনরায় জীবন পথে এগিয়ে চলি।

বীজ যখন মাটিতে বপন করা হয় তখন তার পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ পুরাতনকে ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে সে নতুনকে লাভ করে। আমাদেরও ঠিক তেমনি ভাবে পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করতে হয় নতুনকে পরিধান করার জন্য। মানুষকে জীবন দেয়ার জন্যে। আমাদের জীবনে নতুন আমিত্ব হল পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। যখন আমরা আমাদের জীবনে খ্রিস্টকে গ্রহণ করি তখন আমরা আমাদের জীবনে পুরাতন আমিত্বকে ত্যাগ করতে পারি। তাঁর আলোতে নতুন মানুষ হতে পারি। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-ক্ষুদ্রকে ত্যাগ কর বৃহৎকে পাওয়ার জন্য। আমাদের এই ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করতে হয় বৃহৎ অর্থাৎ পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোকে

লাভ করার জন্যে। "তোমাদের বরং পরে নিতে হবে সেই নতুন মানুষটিকে, যে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে ঐশ প্রতিরুপে, সত্যের প্রভাবে ধর্মিষ্ঠ ও পবিত্র এক সৃষ্টি-রূপে *(এফে ৪ঃ২৪)*।" আমরা যদি নতুন মানুষকে পরিধান করি পবিত্রাত্মার নির্দেশনা অনুসারে জীবন যাপন করি তাহলে আমাদের সব কিছু সুন্দর হয়ে উঠবে। আর তখন আমরা নতুন জীবনের আলোতে পথ চলতে পারব। খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন আমরা যেন নব জীবনের পথে যাত্রা করি। "আর তাই দীক্ষাস্নানে

আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতেই সমাহিত হয়েছি, যাতে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট যেমন পিতার মহিমাশক্তিতে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যে এক নব জীবনের পথে চলতে পারি *(রোমিও ৬ঃ৪)*।"

পূণ্য শনিবার অর্থাৎ নিস্তার জাগরণীর সময় আমরা আলো উৎসব করি। মোমবাতি হাতে নিয়ে শোভা যাত্রা করি। এই শোভাযাত্রা শুধুমাত্র সাধারন শোভাযাত্রা নয়। এই শোভাযাত্রা হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে শোভাযাত্রা। আমরা এই পুনরুত্থান উৎসবে এবং পুনরুত্থান কালে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে শোভাযাত্রা করি। তাঁর সঙ্গে পথ চলি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রদীপ থেকে আমাদের হৃদয় প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত করি। অন্যদেরকেও আলোকিত করার চেষ্টা করি। "কেউ যদি খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে এক নব সৃষ্টি হয়ে উঠে। যা পুরানো, তা তো মিলিয়েই গেছে। দেখ, সমস্তই এখন নতুন হয়ে উঠছে *(২য় করিন্থিয় ৫ঃ১৭)*। আমরা যখন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোয় আলোকিত হই তখন আমরা খ্রিস্টময় হয়ে উঠি। আমাদের মধ্যে অন্যেরা আমাকে নয় খ্রিস্টকে দেখতে পায়। আমি এবং খ্রিস্ট এক হয়ে যাই। সাধু পলের কথা মতো- "এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত আছেন (গালাতীয় ২ঃ২০)।"

পুনরুত্থিত খ্রিস্টই হলেন আমাদের জীবনে নতুন আলো। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট পুনরুত্থানের পর অনেককে দেখা দিয়েছেন। তারা সবাই জীবনের পরিবর্তন করে সেই আলোয় পথ চলেছেন। অন্যদের পথ চলতে সাহায্য করেছেন। আমরা যিশুর শিষ্য-শিষ্যা। যিশুর শিষ্য-শিষ্যা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অন্যদের যিশুর আলোতে পথ চলতে সহায়তা করা, অনুপ্রাণিত করা। এম্মাউসের ঘটনার মধ্যে যিশু শিষ্যদের সঙ্গে যাত্রা করেছেন। থেকেছেন, সহভাগিতা করেছেন। শিষ্যেরা যিশুর সন্ধান লাভ করেছে। যখন যিশুকে চিনেছেন তখন যিশু তাদের মধ্য থেকে মিলিয়ে গেলেন। যিশুকে দেখতে হলে, অভিজ্ঞতা করতে হলে আমাদের অন্তর চক্ষু খুলতে হয়। যখন আমরা অন্তর চক্ষু খুলতে পারি তখন যিশুকে দেখতে পারি। অন্যদেরও যিশুর সন্ধান দিতে পারে। নতুন আলোর দিকে নিয়ে যেতে পারি।

আমরা আমাদের জীবনে নতুন আলোর সন্ধান কম বেশি সবাই লাভ করেছি বা অভিজ্ঞতা করেছি। তাই সময় আমরা যেন সচেতন থাকি। খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন আমার জন্যে। আমি যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলো আমার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত করে সকল অন্ধকার দূর করি। খ্রিস্টই হলেন আমাদের জীবনে নব আলো এই আলোকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা যেন রুপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠি। নিজের আমিত্বকে ত্যাগ করি। নিজে সামনের দিকে এগিয়ে চলি এবং অন্যদের আলোর সন্ধান দেওয়ার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে সহায়তা করি। সেই আলোয় আলোকিত করি॥ ❑

করুণা কর প্রভু

যীশু বাউল

নিবিড়-নিস্তব্ধ নিরিবিলিতে
আমরা আছি এখন।
ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র নভেল করোনা ভাইরাস
কোভিড ১৯
ঘিরে ফেলেছে দশ দিগন্ত, সমগ্র ভূখণ্ড
ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া,
আফ্রিকা।

চারিদিকে ভয়-আতঙ্ক আমাদের গ্রাস করছে
প্রাণঘাতি করোনা নির্দয়ভাবে কেড়ে নিচ্ছে
শত সহস্র প্রাণ: বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুরুষ।

আমাদের আবিস্কার, গবেষণা, ডাক্তারের
সেবা-চিকিৎসা
মেধা-মনন, সৃজনশীলতার পূজি শেষ হবার
পথে
গোটা বিশ্ব সংসার বিষাদময় যন্ত্রণায় মূক,
বধির, বাকহীন।

মৃত্যু মিছিলের শেষ আমরা দেখতে চাই না
গৃহবন্দি মানুষ আমরা এই বিবর্ণ সময়ে
বৈরী বিরাণ বাস্তবতার কাছে বড় অসহায়।

জাত-পাত, হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি ভুলে
বিশ্বলোকের প্রাণ রক্ষার তাগিদ নিয়ে
এসেছি প্রভু
আমাদের সকল পাপ-অপরাধ মার্জনা কর
প্রভু!

আমাদের দম্ভ-অহংকার চূর্ণ কর প্রভু!
আমাদের বিশ্ব সংসার নিরাময় কর পভু!
আমাদের করুণা কর প্রভু!

করুণা কর প্রভু!
করুণা কর প্রভু!

“সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন”

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

প্রাক্-কথা: মৃত্যুর পূর্বে যিশু শিষ্যদের এবং উপস্থিত জনতার সামনে তিন তিনবার তাঁর মৃত্য সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে তার পূর্বাভাষ দিয়েছেন। আড়ালে ডেকে নিয়ে পথ চলতে চলতে তাঁদের বললেন “আমরা এখন যাচ্ছি জেরুসালেমে; সেখানে মানব-পুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁরা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন, তারপর তাকে তুলে দেবেন বিজাতীয়দের হাতে, আর বিজাতীয়েরা তাকে বিদ্রুপ করবে, কশাঘাত করবে এবং শেষে ক্রুশেই দেবে। তারপর তিন দিনের দিন সে কিন্তু পুনরুত্থিত হবে।” *(মথি ২০:১৭-১৯)*

শাস্ত্রে উল্লেখিত বাণী সবই সত্য হয়ে উঠল যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মহিমা প্রকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় মৃত্যুর তৃতীয় দিনে স্বমহিমায় পুনরুত্থিত হয়ে সব পরিকল্পণার সঠিক বাস্তবায়ন করলেন। সকল বিশ্বাসীদের দৃঢ় মনোবল, স্থির বিশ্বাস এবং আনন্দের সুখবর প্রসারে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালেন।

যিশুর মৃত্যু ঘটনা: যিশুকে অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে এ বিষয়ে তিনবার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। এমনটি ঘটবে তা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই হয়েছে। রহস্যাবৃত যিশুর মৃত্যু মানব জাতির জন্য মহা আর্শীবাদ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্তর্নিহিত আছে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে এমন প্রমাণ কেউ কখনো দিতে পারেনি। কিন্তু যিশুর ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। মন্দিরের সেই পর্দাটি ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। একটা ভূমিকম্প হল, পাগাড়ের পাথরগুলো ফেটে গেল; খুলে গেলো যত সমাধিগুহার মুখ। শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত অনেক ভক্তজনের মৃতদেহ তখন পুনরুত্থিত হল। যিশুর মৃত্যুর সময়ে এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন স্ত্রীলোক ছাড়াও বেশ সংখ্যক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। *(মথি ২৭:৫১-৫৬, মার্ক ১৫:৩৮-৪১, লূক ২৩:৪৭-৪৯)* তবে সেখানে উপস্থিতবর্গ এবং ক্রুশে যিশুর মৃত্যুর সময় যারা তাকে পাহারা দিচ্ছিল তারা সকলে খুবই ভয় পেল। এ সময় একজন শতানীক সব কিছু অবলোকন করার পরে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন ঃ “সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।” *(মার্ক ১৬:৩৯)* যিশুর মৃত্যুতে যা কিছু ঘটেছে তার সাঙ্কেতিক অর্থ, প্রাচীন সন্ধির যুগ এবার সম্পূর্ণ শেষ, ইহুদী যাজকতন্ত্রের ভূমিকাও এবার সম্পূর্ণ শেষ। প্রভু যিশুর এই মুক্তিদায়ী প্রায়শ্চিত্ত-সাধনের ফলে আবার খুলে গেছে ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ, তাঁর সঙ্গে চিরকালের মতো মিলিত হওয়ারই পথ *(হিব্রু ১০:১৯-২০)*। শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত অনেক ভক্তজনের মৃতদেহ তখন পুনরুত্থিত হল- একথার বা ঘটনার মর্মার্থ হচ্ছে- যিশু মৃত্যবরণ করে মৃত্যর শক্তিকে জয় করেছেন এবং তিনি যে মৃত ধার্মিক মানুষদের মহাজীবন দিতে চলেছেন, এই ঘটনা তারই একটি ইঙ্গিত।

পুনরুত্থিত যিশু: যিশুর পুনরুত্থানের পরে চল্লিশ দিন ধরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেখা দিয়েছেন। সকলের কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে মৃত্যুর ওপর তাঁর জয় কেউ আটকে রাখতে পারেনি। শিষ্য টমাসকে হাতে-পায়ের ক্ষত চিহ্ন পর্যন্ত দেখিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে পেরেছেন। কবরে যিশুর সমাধি দেখতে গিয়ে স্ত্রীলোকদের পুনরুত্থিত যিশুর উপস্থিতিতে ও তাঁর কণ্ঠ পরিচিত হলে তারা যিশুকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন বা স্পর্শ করতে চাইলে যিশু বরং তাদের পরামর্শ দিলেন তারা যেন তার প্রিয় শিষ্যদের এ সুখবরটি জানায়। স্ত্রীলোকেরা তাই করায় শিষ্যদেরও সন্দেহের অন্ধকার দূরিভূত হল। পুনরুত্থিত যিশুর প্রত্যক্ষ সকল দর্শনপ্রার্থীদের মনে শুধু আনন্দের দিকটিই প্রকাশ পায়নি; বরং এ সুখবরটি সর্বত্র প্রচারিত হলে যিশুর প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এবং এই মঙ্গলবার্তাই আমাদের সমস্ত আশার মূলমন্ত্র। তবে পুনরুত্থানের প্রথম দূত হওয়ার সৌভাগ্য পুরুষ নয় একদল নারীই লাভ করেছিলেন। কালভেরীর পথে ক্রুশের যাত্রায় নারীদের উপস্থিতি, ক্রুশেরতলায় ও সমাধিগুহায় এবং পুনরুত্থিত যিশুকে দর্শন লাভের সুযোগ নারীদের সৌভাগ্যের প্রতীক। আবার লক্ষ্য করা যায় চোখের পানি আর সুগন্ধি তৈল দিয়ে যিশুর পা ধোয়ানো ও চুল দিয়ে মুছে দেবার ঘটনাটিও একজন নারীর দ্বারাই হয়েছিল। যিশু ও নারীর সম্বন্ধে এভাবেই উচ্চ কণ্ঠে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারের বিষয় ঘোষণা করেছেন। এসব কথায় অর্থ এখন কি দাঁড়াল? বিশ্বাসের সাক্ষ্য-প্রমাণে নারীরাই এগিয়ে। পুরুষ তাদের অনুগামী ও পরোক্ষ সাক্ষী।

এম্মাউস নামে একটি গ্রামে যাবার পথে পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে দু'জন ভগ্ন-হৃদয় শিষ্যের কাছে প্রভুর দর্শনদানের ঘটনা সত্যিকারে অবাক করার মত বিষয়। যিশু তাদের বললেনঃ “তোমরা চলতে চলতে নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে এত আলোচনা করছ?” তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। তাঁদের মুখটা তখন ম্লান দেখাচ্ছিল। যিশুকে চিনতে না পেরে ক্লেওপাস নামের একজন বললেন- “গত কয়েকদিনে জেরুসালেমে কী কী ঘটেছে, আপনিই কি সেখানে একমাত্র প্রবাসী মানুষ যিনি তা জানেন না?” যিশু জিজ্ঞেস করলেন ঃ “কী ঘটেছে?” “কেন, নাজারেথের যিশুকে নিয়ে যা-কিছু ঘটেছে! কি কাজে, কি কথায় তিনি তো ছিলেন একজন শক্তিশালী প্রবক্তা। ..... কয়েকজন স্ত্রীলোক অবশ্য আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে ঃ তারা আজ খুব সকালে সমাধিস্থানে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পায়নি। তারা ফিরে এসে জানিয়েছেন যে তারা নাকি স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছে; সেই স্বর্গদূতেরা বলেছেন, তিনি নাকি বেঁচেই আছেন। *(লূক ২৪:১৩-১৯;২২-২৪)* পুনরুত্থিত যিশুকে দেখে এবং তাঁর পরিচয় পেয়ে তাদের মনে উজ্জ্বল প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল। শাস্ত্রে এ কথাও বলা হয়েছে - যিশুর কথা শুনে শিষ্যদের অন্তরে গভীর বিশ্বাস ও আশা যেন আগুনেরই মতো আবার জ্বলে উঠল।

মঙ্গল ও শান্তির বার্তা: প্রভু যিশু প্রেরণকর্মে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন যা অসুস্থ ব্যক্তি, পাপী মন্দ-আত্মায় পাওয়া লোকদের নিরাময়ের জন্য খুবই সহায়ক ছিল এবং আনন্দে, সুখে জীবন-যাপনে শান্তি খুঁজে পেয়েছে। যেমন- যিশু বলেছেন ঃ “তোমার পাপ ক্ষমা করাই হয়েছে।” আবার বলেছেন ঃ “তোমার বিশ্বাসই তোমাকে উদ্ধার করেছে। এবার যাও তুমি, শান্তিতে থাক।” *(লূক ৭:৪৯-৫০)*

যিশু ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত রাজা। যে সব লোক যিশুর অলৌকিক কাজ স্বচক্ষে দেখেছেন তারা বলে উঠলেনঃ “প্রভুর নামেই আসছেন যিনি, রাজা যিনি, ধন্য ধন্য তিনি। স্বর্গলোক জুড়ে, আহা কি শান্তি। উর্ধ্বলোকে উদ্ভাসিত, আহা, কি মহিমা।” *(লূক ১৯:৩৮)*

যিশুর প্রেরিত শিষ্যদের পুনরুত্থানের পর প্রথম দর্শন করে বললেন ঃ“তোমাদের শান্তি হোক।” *(লূক ২৪:৩৬)* যিশু পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন ও বিভিন্ন স্থানে শান্তি বিনিময় করেছেন। প্রিয় শিষ্যদের নিজেই বলেছেন ঃ “তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি; অবশ্য এ সংসার যে-ভাবে শান্তি দেয়, সেইভাবে আমি তোমাদের তা দিয়ে যাচ্ছি না।” *(যোহন ১৪:২৭)*

সাহস নিয়ে জীবন-যাপন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি অভয় দিয়ে জানালেন যে, তোমরা আমার আশ্রয়ে শান্তিতে থাকতে পার আমি সে ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। এ সংসারে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে বটে, তবুও সাহস হারিয়ো না, কারণ আমি যে সংসারকে জয় করেছি। *(যোহন ১৬:৩৩)*

খ্রিস্ট প্রভুর ঐশ ভালবাসাই আমাদের পরিত্রাণের আশা। আমাদের বিশ্বাসের গুণে অন্তরে ধার্মিতা ফিরে পেয়েছি বলে পরমেশ্বর ও আমাদের মধ্যে এখন শান্তি এসেছে। *(রোমীয় ৫:১)*

এফেসীয়দের কাছে সাধু পলের লেখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন- স্বয়ং খ্রিস্টই তো আমাদের মধ্যে শান্তির বন্ধন.....। তাই এসেছিলেন তিনি, তাই প্রচার করেছিলেন শান্তির মঙ্গলবার্তা শান্তি তোমাদেরও জন্যে, যারা দূরে, আর শান্তি তাদেরও জন্যে, যারা ছিল কাছে। *(এফেসীয় ২:১৪,১৭)*

আনন্দ ও শান্তিবার্তায় পুনরুত্থিত যিশু শিষ্যদের দিলেন পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা

বন্ধঘরে শিষ্যরা ধর্মনেতাদের ভয়ে জড় হয়ে বসেছিলেন। এমন অবস্থায় যিশু তাদের মাঝখানে গিয়ে তাদের বললেন ঃ "তোমাদের শান্তি হোক।" .... প্রভুকে সামনে দেখে শিষ্যরা তো মহা আনন্দিত তিনি তাদের আবার বললেন ঃ "তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি।" এই কথা বলার পর তিনি তাদের দিকে একবার ফুঁ দিলেন, তারপর বললেন ঃ "এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারো পাপ ক্ষমা কর, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না কর তা ক্ষমা না করাই থাকবে।" *(যোহন ২০:১৯-২২)*।

যিশুর বার শিষ্যের একজন টমাস। পুনরুত্থিত যিশুর ক্ষতস্থানে স্পর্শ করার অনুভূতি থেকে বলে উঠেছিলেন- "প্রভু আমার ! ঈশ্বর আমার।" যিশু বললেন ঃ "আমাকে তুমি দেখেছ বলেই বিশ্বাস করেছ। যারা না দেখেও বিশ্বাস করে ধন্য তারা।" *(যোহন ২০:২৮)* আমাদের অন্তরে পুনরুত্থিত যিশুর বিশ্বাস, ঐশ জীবনে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

সমাপ্তি সূচক কথা: পুনরুত্থিত খ্রিস্ট প্রভু যিশু আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন বিশ্বাস, ঐশরিক শক্তি, আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সুযোগ। সাধু পল খ্রিস্টীয় ঐক্য বজায় রাখার বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। শোন, ভাই, তোমরা আনন্দেই

থাক, পূর্ণতা লাভের পথে এগিয়েই চল। একে অন্যের অন্তরে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল; হয়ে ওঠ একমন একপ্রাণ; নিজেদের মধ্যে তোমরা শান্তি বজায় রেখে চল। তাহলে সেই প্রেমবিধাতা, শান্তিবিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সহায় থাকবেন। ----- প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পরমেশ্বরের ভালবাসা ও পবিত্রআত্মার সাহচর্য তোমাদের সকলকে নিত্যই ঘিরে রাখুক। *(২ করি ১৩:১১-১৩)*

প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ ও শান্তিবার্তা সকলের অন্তরে নব জাগরণ, উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরে উঠুক, সুরকারের কণ্ঠে বেজে উঠে এমনই সুর-

কি আনন্দ- ধ্বনিতে আজ ভরেছে অম্বর।
মৃত্যুরে জয় করে প্রভু হয়েছেন অমর।।
এই সমাচর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবে সবার তরে।
ওরে, খ্রিস্ট তোরে দেখা দেবেন, সাজা
তোর অন্তর।।

(গীতাবলী ৯৯৩)

সকলকে জানাই পাস্কাপর্বের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা!! ❑

ক্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণা

মিনু গরেট্টি কোড়াইয়া

ক্রুশকাষ্ঠে তাঁর মৃত্যু দেখেছি
বেদনার লাল রক্তে ছেয়ে গেছে পথ
আমি ঐ পথ এড়িয়ে গেছি আশঙ্কায়
বারবার ভিন্ন পথে ছুটে গেছে রথ॥

এখনও ভেসে আসে সেই কান্নার ধ্বনি
ধূলিপথ ভরে উঠে কেবলই অশ্রুপাতে
কণ্ঠদেশ রোধ হয়ে আসে ব্যর্থ বিলাপে
আমার তরী পাল তোলে অন্যস্রোতে॥

কালভেরীর পর্বত বুকে এখনও হাহাকার
নিজেরে আড়াল রাখি সংকীর্ণ গহ্বরে
বিষাদের নীল ছায়া বুঝি পড়ে না
এইখানে
একাকি নিমগ্ন রই সকল ক্লেশ সংহারে॥

আমি জন্মান্ধের মত পড়ে রই অন্ধকূপে
পার হই জ্বালাময় গিরির সুতীব্র দহন
রাতদিন থাকি নির্জন কারাবাসে আবদ্ধ
যেন না শুনি ঐ ক্রুশকাষ্ঠের রোদন॥

শরীর জুড়ে দেখেছি কত পাথুরে প্রলেপ
মৃত্যুর করাল গ্রাসে থেমে যায় নিঃশ্বাস
শরীর বিদীর্ণ করে ঘটে আত্মার আবির্ভাব
এ তো নয় অলিক-ভ্রান্ত, নয় অবিশ্বাস॥

এ যে নিখুঁত নিয়তি জীবনের অনিবার্য
নেই কোনো উপায় মিছেই লুকানোর ছল
তুলে আনবে তীরে অতল গহ্বর থেকে
মিছেই খুঁজি মরণকে এড়ানোর কৌশল॥

ক্রুশকাষ্ঠে তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে দেখে
নিস্তার পেতে করেছি বহুদূরে পলায়ন
সেই মৃত্যু ছাড়েনা পিছু,
ভুলে না কিছুতেই
বলে, "এসো, এ পথেই হবে স্বর্গে গমন"॥

অবশেষে ভয় ভুলে কালভেরী পর্বতে ছুটি
মৃত্যু যন্ত্রণার ক্রুশ ন্যস্ত হোক নিজ কাঁধে
দাও আমায় বিধি সেই চির শাশ্বত বিধান
ঘুচাও দণ্ড, না রই যেন পাপ-অপরাধে॥

খ্রিস্ট জীবিত সকলের মাঝে

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

যিশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের সেই বাণী যাঁর বিষয়ে যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে, "আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর দ্বারাই সব-কিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল এবং যা কিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল, তাঁর কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া অস্তিত্ব পায়নি" *(যোহন ১: ১-৩)*। 'সেই পরাক্রমী সৃষ্টিকর্তাকে কেই বা হত্যা করতে পারে? তিনি নিজে নিজেকে নমিত না করলে কারই বা ক্ষমতা আছে তাঁকে হত্যা করার? অসীম হয়েও তিনি নিজেকে অবনমিত হতে দিলেন, নিজেকে বলিকৃত হতে দিলেন, ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু কেন? এই 'কেন'-এর উত্তর হলো মানুষের পরিত্রাণ। তিনি মানুষের পাপহরণ করলেন, পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন; তিনি পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে উন্নীত হলেন এবং নিজের সাথে আমাদের পুনরুত্থান ও স্বর্গ লাভ নিশ্চিত করলেন।

আমাদের প্রভু আপন ঐশ স্বরুপ বজায় রেখে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশ মৃত্যু পর্যন্তই বাধ্য হলেন। তিনি (যিশু) যন্ত্রণাময় মৃত্যুর স্বীকার করেই সেই শাশ্বত আনন্দের শয্যা ছেড়ে দিলেন এবং তখনই তাঁর সেই শয্যা দুর্বলতায় পরিণত করলেন যখন পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা গুণে তিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষের দ্বারা অপমানিত হলেন। তাই তো শক্তিমান হয়েও দুর্বলতাকে, জীবনদাতা হয়েও মৃত্যুর অধীনতাকে ও অনাদি কালীন বিচারকর্তা হয়েও তিনি নিজেকে ক্রুশদণ্ডের যোগ্য অপরাধী করলেন।

খ্রিষ্ট চরম দুঃখ-যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ভোগ করলেন। তবুও তিনি একবারের জন্যে ও মুখ খুলেননি বা প্রতিবাদ করেননি। তিনি নিরব, নিরব হয়েই রইলেন; ঠিকবাধ্য মেষের মতো। শয়তানের প্রলোভন, মায়ের করুণ চাহনি, কান্না, হতাশা, কষ্ট, সৈন্যদের অপমান, নির্যাতন কোন কিছুই তাঁকে পিছু পাকরতে পারেনি। বরং দৃঢ় পদক্ষেপে ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন; মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু কবর ও তাকে ধরে রাখতে পারেনি। মৃত্যুকে, অশুভকে পরাজিত করেছেন, মৃত্যুকে দিশেহারা করে শয়তানকে হতাশায় নিক্ষেপ করলেন। যেমন, মোশী ফারাও রাজাকে কান্নায় বা হতাশায় নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনিই মোশীর মত অধর্মকে আঘাত করলেন ও ধর্মময়তাকে পুরস্কৃত করলেন।

খ্রিস্ট সকলের বোঝা বরণ করে নিলেন। তিনি হলেন আবেলে নিহত, ইসায়াকের শেকলাবদ্ধ, যাকোবে প্রবাসী, যোসেফে বিক্রীত, মোশিতে জলে সমর্পিত, দাউদে নির্যাতিত ও সকল প্রবক্তাদের মধ্যে বেশি অপমানিত। তিনি হলেন কুমারিত্বে দেহধারী, ক্রুশে ঝুলানো ও মাটিতে সমাহিত। তিনিই সেই নিরব মেষশাবক, তিনিই সেই মেষশাবক যিনি পাল থেকে উপনীত, জবাইখানায় চালিত, সন্ধ্যায় বলিকৃত ও রাত্রিতে সমাহিত। হ্যাঁ, তিনিই সেই মেষশাবক ক্রুশকাষ্ঠের উপর যার কোন হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়নি, মাটির গর্ভে যার হয়নি ক্ষয়, সাধু আগষ্টিন বলেন, "অপূর্ব সুন্দর ঈশ্বর, আর ঈশ্বরের সাথে বাণী....তিনি স্বর্গে যেমন সুন্দর, তেমনি মর্তেও সুন্দর। তিনি গর্ভে সুন্দর, পিতা-মাতার কোলে সুন্দর, অলৌকিক কাজে সুন্দর, তিনি মৃত্যু সমন্ধে দুশ্চিন্তা না করায় সুন্দর, তিনি মৃত্যুতে সুন্দর এবং তিনি পুনরুত্থানে সুন্দর। তিনি ক্রুশের উপর সুন্দর, সমাধিতে সুন্দর, স্বর্গে সুন্দর।" সুতরাং তিনি সব সময় সুন্দর, সব জায়গাতেই সুন্দর।

খ্রিষ্ট আজ মহাগৌরবে পুনরুত্থান করেছেন এবং জীবিত আছেন। যিশুর পুনরুত্থানই আমাদের বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান উৎস ও ভিত্তি; যা খ্রিস্টভক্তের জীবনে আনে প্রকৃত শান্তি এবং আনন্দ। তিনিই দাসত্ব থেকে মুক্তিতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, স্বৈরশাসন থেকে শাশ্বতরাজ্যে আমাদের বের করে আনলেন ও করে তুললেন তাঁর আপনজাতি। খ্রিস্টের এখন আর মুখ নেই, আমাদেরই আছে মুখ। সর্বত্র খ্রিস্টের বাণী প্রচার করার জন্য। খ্রিস্টের এখন আর কোন হাত নেই, পা নেই। বরং আমাদেরই আছে হাত পা। যেন সকলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে পারি।

পুনরুত্থানে আমাদের প্রতি খ্রিস্টের আহ্বান হলো আমরা যেন আমাদের পাপময়তার মৃত্যু ঘটাই এবং শুধুমাত্র খ্রিস্টেরই জন্য জীবন যাপন করি। অধর্ম ত্যাগ করে যেন ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করতে পারি। আমাদের ব্যক্তিগত ক্রুশ, যাতনা, অবহেলা আমরা যেন অনুশীলন করার পথ খুঁজে বের করতে পারি। খ্রিষ্ট আমার সাথে সর্বদা ছিলেন, আছেন, আর থাকবেন। পুনরুত্থিত যিশু আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য পরম গৌরব ও অনুপ্রেরণার উৎস হোক॥ ❑

সহায়িকা গ্রন্থ,
'সন্ন্যাস প্রাহরিক উপাসনা'

পুনরুত্থিত যিশুতে জীবনযাপন

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

প্রভুর পুনরুত্থানের গুরুত্ব প্রাবক্তিক উক্তিতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে : এই তো সেই দিন, ভগবানের বিরচিত সেই দিন, এই দিনে এসো আনন্দ করি, এসো উল্লাস করি" *(সাম ১১৮:২৪)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান পরিত্রাণের ইতিহাসে মহিমান্বিত ঐশ্বর্যময় ঘটনা। পুনরুত্থান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যিশু হচ্ছেন সেই পুনরুত্থিত খ্রিস্ট ' যিনি ছিলেন, যিনি আছেন তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই সূচনা তিনিই সমাপ্তি! তাঁরই হাতে কালচক্র, তাঁরই হাতে যুগ-যুগান্ত! তাঁর পবিত্র ও গৌরবান্বিত পক্ষক্ষতের গুণে তিনি আমাদের রক্ষা ও পালন করেন।

যিশু হলেন মরণ-বিজয়ী মহাবীর। মৃত্যুকে জয় করে আবার বেঁচে ওঠা একেবারে অভিনব, অভুতপূর্ব ঘটনা। যিশুর কাছে মৃত্যু হার মেনেছে। তাই সাধু পল বলেছেন: "ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? কোথায় মৃত্যু, তোমার সেই অঙ্কুশ ?" *(১ করিন্থীয় ১৫: ৫৫)*। খ্রিস্টমণ্ডলী ও বিশ্বাসীভক্তের মিলন সমাজ হলো পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দেহ। খ্রিস্টীয় জীবন হলো নতুন জীবন, খ্রিস্টেতে জীবন যাপন। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের মত চিন্তা ও কাজ করা।

বাইবেলীয় অনুধ্যান : কি বার্তা দিয়ে যায় পুনরুত্থান উৎসব ?

"আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন তাহলে, আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন! " *(১ করি ১৫: ১৪)*। 'তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব কিছু পেতে চেষ্টা কর, যা রয়েছে উর্ধ্বলোকে। তোমাদের মনটা সর্বদাই ভরে থাকুক ওই উর্ধ্বলোকের যা কিছু, তারই চিন্তায়; যা কিছু এই মর্ত্যলোকের, তার চিন্তায় নয়' *(কলসীয় ৩:১)*।

'খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সহভাগি হতে গেলে আমাদের পুরাতন আমিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে' *(দ্র: কলসীয় ৩:৯)*। সাধু পল বলেন " তোমরা কি এই কথা জানো না যে, দীক্ষাস্নানে খ্রিস্টযিশুতে অবগাহিত হয়ে আমরা সকলে তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই অবগাহিত হয়েছি ? আর তাই দীক্ষাস্নানে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতেই সমাহিত হয়েছি, যাতে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট যেমন পিতার মহিমাশক্তিতে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যেন এক নব জীবনের পথে চলতে পারি। কারণ আমরা যখন তাঁর মতো মৃত হয়েই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছি, তখন তাঁর মতো পুনরুত্থিত হয়েই তাঁর সঙ্গে আমরা তো এক হবই। আমরা তো জানি, খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের পুরানো আমিটা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, সেই পাপ সত্তাটা যাতে বিনষ্ট হয়, আমরা যেন আর পাপের দাস না থাকি। কারণ মৃত্যু যার হয়েছে, সে পাপ থেকে মুক্তিও পেয়েছে। *(রোমীয় ৬:৩-৭)*। খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস। " মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে" *(রোমীয় ১০:৯)*।

পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন পথ চলা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি!

আমরা কি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের স্পর্শ পেয়েছি? লোকেরা কি আমাদের জীবনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ছাপ দেখতে পায়? লোকেরা কি আমাদের মধ্যে জাগ্রত পুনরুত্থিত নব জীবন যাপন দেখতে পায়? আমরা কি সত্যিই পুনরুত্থিত ব্যক্তি? (Are we really people of Easter) কোথায় আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেতে পারি? আমরা কি করতে পারি যে কারণে বিশ্বাসীভক্তগণ সত্যিই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সম্মুখীন হতে পারে? What can we do so that people really encounter the Risen Jesus? In whom have I recognized the presence of the Risen Jesus this week? How can I share my belief in Jesus's resurrection with others today?

মানুষের মানবিক মুল্যবোধ, মর্যাদা, নৈতিকতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা মানুষের জীবন থেকে তিনি দিন নির্বাসিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের জোয়ার এখন চারিদিকে। ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আত্মার চেয়ে দেহের প্রয়োজনই এখন বড় বেশি অনুভূত হচ্ছে। আত্মিক জীবনের প্রতি উদাসীনতা, বিমুখীতা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যেন প্রবল হয়ে উঠছে, যা উদ্বেগজনক।

খ্রিস্টীয় জীবন নেতিয়ে পড়া, ঝিমিয়ে পড়া জীবন নয়। দেশে, সমাজে, মণ্ডলীতে বিরাজমান অন্যায়, অবিচার, অসত্য, দুর্নীতি, শোষণ, নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করে সুষম সুন্দর ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করতে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের চেতনা আমাদের অনুপ্রেরণা দান করে ।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান একটি আহবান- একটি সুযোগ। পুনরুত্থানের বারতা তো স্বাধীন ও মুক্ত হওয়ার আহ্বান। আমরা যদি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পাই, তাহলে আমরা তো খ্রিস্টীয় আচরণ করব। দুর্নীতির জয়গান গাইতে পারবো না। কথা ও আচরণের ছুরি দিয়ে ভাইবোনদের আহত করবো না। আলোর পথেই চলবো। যখন আমরা একত্রে ন্যায্যতা, শান্তি , পুর্নমিলন ও মানব উন্নয়নের কাজে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখব তখনই আমরা পুনরুত্থিত যিশুর কার্য সম্পাদনের যন্ত্র হয়ে উঠব।

পুনরুত্থানের শক্তি ও মহিমা

একটি নতুন বিবাহিত দম্পতি তাদের ভবিষ্যত সন্তানের বীমা পেতে চেয়েছিল। তারা বিভিন্ন বীমা সংস্থাগুলিকে ডেকেছিলেন এবং তারা যে প্রস্তাব দিতে পারে তার সর্বাধিক বিস্তৃত বীমা কভারেজ প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। তিনজন এজেন্ট এসে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার/আরো ভাল করার চেষ্টা করেছিল। প্রথমটি প্রস্তাব করেছিল: আমরা আপনার ভবিষ্যতের শিশুকে ঝুড়ি থেকে কাসকেটে বীমা করিয়ে দেব। (we will insure your future child from the basket to the casket.)" দ্বিতীয়টি প্রথম অফারের থেকে ভাল ছিল। আমরা

আরও ভাল করতে পারি আমরা আপনার শিশুকে প্রসব করা থেকে কবরস্থান পর্যন্ত বীমা করতে পারি। (We can do better. We can insure your child from delivery to cemetery.) তৃতীয়টি বলল : আমাদের কাছে সেরা অফার রয়েছে। আমরা আপনার সন্তানের গর্ভ থেকে কবর পর্যন্ত বীমা করতে পারি। (we have the best offer. We can insure your child from the womb to the tomb.)

স্ত্রী সন্তুষ্ট নন, তাই এজেন্টদের জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাদের আর কোন অফার রয়েছে যা সব অন্তর্ভুক্ত করবে! এজেন্টরা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে কেবল ঈশ্বর এটি সরবরাহ করতে পারেন। (Not satisfied, the wife asked the agents : " is there an all-embracing coverage you could offer? The agents responded, " There is, but only God can provide it") স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন- এটা কি? তারা জবাব দিয়েছিল, গর্ভধারণ থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত। সত্যিই, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের সম্পুর্ণ বীমা দিতে পারেন। ঈশ্বর আমাদেরকে যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত নির্ভয় করেছেন গর্ভধারণ থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত। (They replied," From conception to resurrection." Indeed, God alone can give complete insurance for our lives. God has secured us through Christ from conception to The Resurrection.) ঈশ্বর ইতোমধ্যে যিশু খ্রিষ্টের যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের চিরন্তন বীমাগুলির প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন। ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা এবং অনুগ্রহের অফারের সাথে আমাদের সহযোগীতার মাধ্যমে আমাদের মাসিক প্রিমিয়াম প্রদান করা দরকার। (God has already paid the premium of our eternal insurance through Jesus' Christ's Passion, Death, and Resurrection All we need to do is to pay our monthly premium by way of our cooperation with God's offer of His love and grace.)

আসলে এ ধরণের বীমা কিনতে হবে না। এটি নিখরচায় দেওয়া (বিনামুল্যে পাওয়া) একটি উপহার। আমরা এটির প্রাপ্য না। আমাদের যা দরকার তা হল অনুগ্রহ /উপহার গ্রহণ করা এবং এর দ্বারা বেঁচে থাকা। (We do not actually need to buy this type of insurance. It is a gift freely given. We do not even deserve it. All we need to do is to receive the gift and live by it.)

উপসংহার

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা প্রদান করে। আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসীভক্ত। আমরা আশার মানুষ। (We are an Easter People. We are a people of Hope). যখন আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সহায়তায় আমাদের পাপকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই, তখনই আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত শক্তি কাজ করে। মৃত্যুর উপর খ্রিস্টের জয়ে আমরা উল্লসিত হই ও আনন্দ করি। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের কষ্ট ও মৃত্যু বৃথা যাবে না। যিশুর পুনরুত্থান প্রকাশ করে যে, ভালবাসা পাপ ও মৃত্যুর চেয়েও বেশী শক্তিশালী। "কোন - কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিস্ট যিশুতে নিহিত ঐশ ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না : মৃত্যু নয়, জীবনও নয়, কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উর্ধ্ব বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা সৃষ্ট অন্য কোন কিছুও নয়! *(রোমীয় ৮:৩৯)*।

আধ্যাত্মিক লেখক টমাস মেরটর বলেন : আমরা কেবল এটাই বিশ্বাস করতে আহূত নই যে, খ্রিস্ট একদিন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন - বরং আমরা আহূত হয়েছি যাপিত জীবনে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতায় প্রতিদিন পথ চলতে - যিশুকে অনুসরণ করতে; যিনি আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। (Thomas Merton said : " We are called not only to believe that Christ once rose from the death... no, we are called to experience the resurrection in our own lives, by following Christ who lives in me.)

তথ্যসূত্র : Fr. Roberto B.Manansala, OFM, Echoes of God's Love : Homilies for Liturgical Year Cycle B & C, Our Lady of the Angels Seminary-College, Quezon City : Philippines, 2014. ❑

পুনরুত্থানের শক্তি

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

২০:২৬-২৯ পদ)।

যিশু আরো ৫০০ শিষ্যদের দর্শন দিয়েছিলেন যা ১ করিন্থিয় ১৫:৬ পদে বর্ণিত আছে। যদিও নির্দিষ্ট তারিখ বর্ণিত নেই কিন্তু যিশুর দর্শন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে এবং তা সত্য।

যিশু তার শেষে ভোজের পর (যুদার বিশ্বাস ঘাতকতার পর) যখন গেৎসিমানী বাগানের দিকে হাঁটছিলেন তখন তিনি ১১জন শিষ্যকে বলেছিলেন যে পুনরুত্থানের পর আমি তোমাদের আগেই গালিলেয়ায় যাবো *(মথি ২৮:১৬-১৭)*। বিশ্বাস করা হয় গালিলেয়া যিশু শিষ্যদের সাথে দেখা দেখা করেন এবং বাইবেল এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে।

এ সময়ের মধ্যে যিশু তার ৭জন শিষ্যকেও (পিতর, যোহন, জেমস, টমাস, নাথানায়েল এবং অন্য ২জন শিষ্য সম্ভবত আন্দ্রেয় ও ফিলিপ) দেখা দেন *(যোহন ২১:১-২৪ পদ)* যারা গালীল হ্রদে মাছ ধরছিল। সেদিন পিতর ও অন্যান্য শিষ্যরা ১৫৩ টি মাছ ধরেছিল। যিশু তিন বার পিতরকে প্রশ্ন করেছিলেন 'পিতর তুমি কী আমাকে ভালবাস?'।

যিশু স্বর্গারোহনের দিন জলপাই পাহাড়ে *(শিষ্যচরিত ১: ৯-১৪ পদ)* এর শিষ্যদের দর্শন দেন। স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি শিষ্যদের বলেন জেরুসালেমে আরও ১০দিন অপেক্ষা করতে। কারণ তিনি চলে গেলে তার সহায়ক পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে আসবেন। *(মথি ১৬:১৯-২০, লুক ২৪: ৫০-৫৩, শিষ্যচরিত ১:৬-১১ পদ)*।

যিশুর কথামত শিষ্যরা ১০দিন জেরুসালেমে অপেক্ষা করে তার প্রতিশ্রুত আত্মাকে গ্রহণ করার জন্য। এ দিন হল খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্ম দিন। যে দিন পবিত্র আত্মার কৃপায় ৩১২০ জন যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন অর্থাৎ দীক্ষিত হন। শিষ্যরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করে সকল ভয় বাধা থেকে মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। নির্ভয়ে প্রচার করেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কথা এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্রআত্মার নামে দীক্ষিত করেন। *(শিষ্যচরিত ২: ১-১২ পদ)*

পরিশেষে বলতে চাই যিশুর পুনরুত্থান এমন এক শক্তি যে শক্তি মানুষে-মানুষে মিলন নিয়ে আসে, হিংসা বিদ্বেষ-এর পথ ছেড়ে দিয়ে শান্তির সমাজ গড়ে তুলে, জীবন ভরে উঠে ঐশ আনন্দে। আসুন খিস্টেতে নিজেদের সমর্পণ করে জীবনের সমস্ত মলিনতা ধুয়ে দিয়ে, বদঅভ্যাস ও পাপের পথ ত্যাগ করে খ্রিস্টের সাথে পুনরুত্থান করে পুনরুত্থিত নতুন দেহ, মন ও আত্মা লাভ করি॥ ❑

পুনরুত্থানের শক্তি

ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি

যিশুর পুনরুত্থান একটি সত্য, একটি রহস্য, শক্তি ও বিশ্বাস। এই পৃথিবীতে যিশু খ্রিস্টই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন। খ্রিস্টের পুনরুত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, অলৌকিক বিষয়। পুনরুত্থানের শক্তি এমনই এক অনন্য শক্তি যা গোটা বিশ্বের চিত্রকেই পরিবর্তন করে দিয়েছে। কোটি কোটি মানুষকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে, একই বিশ্বাসে মিলনাবন্ধন হয়ে গড়ে তুলেছে নতুন খ্রিস্টীয় সমাজ। খ্রিস্টভক্তগণ তাদের বিশ্বাসের গভীরতা, খ্রিস্টের প্রতি আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ, সেবা ও ভালবাসা দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে এই পৃথিবীতেই ঐশরাজ্যের মিলন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

পুনরুত্থানের শক্তি: যিশু খ্রিস্ট মানুষ হলেন যেন তিনি মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যেতে পারেন। মর্ত্যলোকে যিশুর প্রকাশ্য জীবন ছিল সম্পূর্ণ জীবনের সার স্বরূপ। তাঁর প্রকাশ্য জীবন ছিল মাত্র ৩ বছর কিন্তু এ ক্ষুদ্র সময়ের মাহাত্ম্য অনেক গভীর। এ সময় তিনি পূর্ণ করেছেন সমস্ত গ্রন্থে উল্লেখ্য তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী, পুরাতন নিয়ম বাতিল না করে দিয়েছেন পূর্ণতা এবং সমস্ত আজ্ঞার মূল আজ্ঞা হিসেবে দিয়েছেন ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালবাসতে। এমন কি তিনি নিজের ভাবী মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কেও বলেছেন। যিশু যদি পুনরুত্থান না করতেন তবে ব্যর্থ আমাদের এ বিশ্বাস ও ধর্ম পালন। খ্রিস্টমণ্ডলীর কোন অস্তিত্বই থাকতো না। পুনরুত্থানের শক্তির কারণেই খ্রিস্ট মণ্ডলী সুপ্রতিষ্ঠিত, কোটি-কোটি মানুষ খ্রিস্ট বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে খ্রিস্টের সাথে অনন্ত জীবন থাকার প্রত্যাশায় পার্থিব জীবনকে হাজার-হাজার মানুষ নির্ভয়ে উৎসর্গ করেছেন অকাতরে। পুনরুত্থানের শক্তিই এ সন্তজনদের মনে এমন প্রেরণা জাগিয়েছিলেন যার বলে তারা হিংস্র পশুর মুখে ছিন্ন-ভিন্ন হতে ভয় করে নি, গরম তেলে ভাজা হতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি, শরীরে তেল মেখে আগুন ধরিয়ে দিলেও ভয়ে এতোটুকুও কেঁপে উঠেনি, হাসি মুখে গলা নামিয়ে দিয়েছেন তলোয়ারের নিচে, চামড়া ছিলে লবণ দিলেও ত্যাগ করেননি খ্রিস্টের পথ। তারা উচ্চ স্বরে বলেছে আমার হাত, পা, চোখ হারালেও পরকালে আবার তা ফিরে পাবো। শত্রুদের বলেছেন তোমরা আমাদের দিচ্ছ ক্ষণিকের কষ্ট। কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের দিবেন অনন্তকালীন আনন্দ। যিশুর মহিমা করতে করতে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং খ্রিস্টের মত শত্রুদের ক্ষমা করে দেখিয়েছে ভালবাসার আদর্শ। আজ যে খ্রিস্ট মণ্ডলী দাঁড়িয়ে আছে এর ভিত সুদৃঢ় কারণ তা বিশ্বাসীদের রক্তে তৈরী করা ভিত। আর এ সমস্ত কিছুর কেন্দ্রীয় শক্তিই হচ্ছে পুনরুত্থানের শক্তি।

পুনরুত্থান ও নবজন্ম: পুনরুত্থান মানেই নবজন্ম। পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি নতুন দেহ ও একটি নতুন পরিচয়। পুনরুত্থিত দেহ কোন সীমায় আবদ্ধ হয়, কোন বাঁধাই বাঁধা নয় কারণ এ দেহ হয়ে উঠে ঐশ দেহ। যে কোন সময়, যে কোন স্থানে যেতে পারে এমনকি ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও ঘরে প্রবেশ করতে কোন সমস্যা হয় না। আধ্যাত্মিক ভাবে পুনরুত্থান মানে মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করা। আমরা অন্যভাবেও পুনরুত্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন অভ্যাস, অবস্থা, পাপের পথ পরিত্যাগ করার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত হতে পারি। যিশু যেমন মানুষের পাপ-কালিমা নিয়ে কবরে শায়িত হয়েছিলেন এবং তা মাটি চাপা দিয়ে পুনরুত্থান করেছেন ঠিক তেমনি আমরাও আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন খারাপ অভ্যাস যেমন: মাদকাসক্তি, যৌনাচার, চুরি, ডাকাতি এ সমস্ত বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করে যা আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক মৃত্যু নিয়ে আসে তা থেকে পুনরুত্থিত হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি। কারণ আমরা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পারি মাদক্তাসক্তি একটি সুন্দর পরিবারকে মৃত্যু পুরীতে পরিণত করে, ধ্বংস করে সমস্ত আনন্দ, বেঁচে থেকেও একটি পরিবার লাভ করে মৃত্যু যন্ত্রণা। যখন সেই আসক্ত ব্যক্তি মাদকাসক্তিপথ পরিত্যাগ করে তখন সেই পরিবার নতুন জীবন লাভ করে, পরিবারে ফিরে আসে শান্তি পায় পুনরুত্থানের আনন্দ। কারণ তাদের প্রিয় মাদকাসক্তির মৃত্যুপূর্ণ অবস্থা থেকে পুনরুত্থান লাভ করেছে। একই ভাবে যৌন অনাচার, ব্যভিচার, পরকীয়া প্রেম বৈবাহিক পবিত্র বন্ধনকে কলুষিত করে, চিরস্থায়ী বন্ধনের মধ্যে ভাঙ্গন তৈরি করে, বিচ্ছেদ নিয়ে আসে, অবিশ্বাস তৈরি করে এবং সুন্দর ভালবাসার সংসার হয়ে উঠে ঘৃণার সংসার। এ অনৈতিক জীবন ত্যাগ করলেই প্রতিটি পরিবারই হয়ে উঠে নাজারাথের পুণ্য পরিবার।

যিশুর পুনরুত্থানের সত্যতা: যিশুর পুনরুত্থান কোন কাল্পনিক ঘটনা নয়, মন গড়া কোন বিষয় নয়, স্বপ্ন নয়। এ এক পূর্ব ঘোষিত, ঐতিহাসিক ভাবে সত্য ও বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত একটি বিষয়। যা কোন ভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। যিশু মৃত্যুর পূর্বে বার বার বলেছেন তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন এবং তিনি পুনরুত্থানের পর বার বার শিষ্যদের দেখা দিয়ে প্রমাণও করেছেন যে তিনি পুনরুত্থিত।

৪টি ঐতিহাসিক বিষয় যা যিশুর পুনরুত্থানের দৃঢ় সত্যতা প্রকাশ করে:

১। যিশুর সমাধি: মৃত্যুর পর যিশুর সমাধি এ বিষয়টি ৪টি মঙ্গলসমাচারেই খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে এবং সাধু পলের বিভিন্ন পত্রাবলিতেও বর্ণিত আছে। সাধু মার্কের মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যিশু যন্ত্রণা, মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান ঘটনাবলির ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় যা যিশুর মৃত্যুর ৭ বছরের মধ্যে একজন ব্যক্তির Rudolf Pesch প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে সাক্ষ্য। সাধু মথি, লুক ও যোহনের মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত আছে আরিমাথিয়া যোসেফ যিশুকে ক্রুশ হতে নামিয়ে সমাধিস্থ করেছিলেন।

২। শূন্য সমাধি: যিশুর শূন্য সমাধি

সম্পর্কে সাধু মথি ও সাধু যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারের খুব স্পষ্টভাবেই বর্ণিত আছে। এছাড়া শিষ্যচরিতে এবং সাধু পলের করিন্থিয়দের কাছে ১ম পত্রে শূন্য সমাধি সম্পর্কে বর্ণিত আছে। শূন্য সমাধি প্রথমত একদল নারী আবিষ্কার করে। একজন ইহুদী ইতিহাসবিদ যোসেফাস বলেন সেই সময় ইহুদী আইন অনুসারে নারীদের সাক্ষ্য প্রকৃত সাক্ষ্য হিসেবে ধরা হতো না বা নারীরা সাক্ষ্য দিতে অনুমতি প্রাপ্ত ছিল না। নারী দলের শূন্য সমাধি আবিষ্কারের পরপরই আসে যিশুর দুইজন পুরুষ শিষ্য সাধু পিতর ও যোহন। যাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য কোন ভাবেই বাতিল যোগ্য নয় এবং দুই জনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য তা অভ্রান্ত সত্য হিসেবেই ইহুদী সমাজে গৃহীত।

৩। পুনরুত্থানের পরবর্তী দর্শন: যিশু পুনরুত্থানের পর তাঁর বিভিন্ন শিষ্য, ব্যক্তি ও দলের কাছে দর্শন দিয়েছেন। তিনি তাঁর এক নারী ভক্ত মারীয়াকেও দর্শন দিয়েছেন। যখন শিষ্যরা যিশুর মৃত্যুর পর হতাশায় পুরনো পেশায় ফিরে গিয়েছেন তখন সমুদ্রের ধারে সাধু পিতরকে দেখা দিয়েছেন। বন্ধ ঘরে সকল শিষ্যদের (সাধু টমাস ব্যতিত) মাঝে ঘরে আসেন এবং দেখা দেন, পরবর্তীতে আবার সাধু টমাস সহ সকল শিষ্যদের মাঝে দেখা দেন। তখন তিনি সাধু টমাসকে তাঁর হাতে পেরেকের চিহ্নে ও বুকে বর্শার ক্ষত চিহ্নে হাত দিয়ে দেখতে বলেন যেন সে সত্যিই বিশ্বাস করে যিশু পুনরুত্থান করেছেন এমন কি তিনি সবার সামনে ভাজা মাছ খেয়েও দেখিয়েছিলেন। এম্মাউসে যাবার পথে দুইজন শিষ্যকে দেখা দিয়েছিলেন এবং যাদের সাথে তিনি রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান করেন যা দেখে শিষ্যেরা চিনতে পারেন তিনি পুনরুত্থিত যিশু। তিনি একসাথে ৫০০জন শিষ্যদের দর্শন দিয়েছিলেন। শেষে সাধু পৌল যখন দামাস্কাসে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকেও দেখা দেন।

৪। শিষ্যদের বিশ্বাস যিশু পুনরুত্থিত এবং এর সাক্ষ্য বহণ করেন: যিশু মৃত্যুর পর এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে তা সত্যিই আমাদের পক্ষে অনুভব করা সহজ নয়। শিষ্যরা যাকে গুরু হিসেবে, ইস্রায়েল জাতির মুক্তিদাতা, রাজা ও মোশীহ হিসেবে বিশ্বাস করেছিল আজ তারই মৃত্যু হয়েছে। ইহুদী ধর্মগুরুরা তাকে ইহুদীদের শত্রু, রাজদ্রোহী ও অপরাধী হিসেবে ক্রুশে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। যিশুর মৃত্যুতে শিষ্যদের সমস্ত আশা, ভরসা, স্বপ্ন, সাহস শেষ হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেও তারা বিশ্বাস করেছিল যে যিশু পুনরুত্থান করবেনই। সত্যিই তিনি মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন।

যিশু মৃত্যু বরণ করেন পুনরুত্থিত হতে: যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান মুক্তির ইতিহাসের পূর্ণতা দান করেছে। এদেন বাগানে ঈশ্বরের অবাধ্যতা ছিল মানুষের প্রথম পাপ যার কারণে মানুষ স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। মানুষের জন্য স্বর্গরাজ্যে দ্বার বন্ধ হয়েছিল এবং মানুষ শয়তানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। মানুষের জন্য পুনরায় স্বর্গের দ্বার উন্মোচন করতে এবং পাপের ও শয়তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পিতা আপন পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর মানুষ হয়েছিল যেন মানুষকে নিয়ে স্বর্গ যেতে পারেন। পাপের ও শয়তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরপুত্রকে মানুষ হিসেবে এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার আবশ্যকতা ছিল। ঈশ্বর থেকে মানুষ হওয়ার এ সংস্কৃত্যায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা অর্থাৎ মুক্তির পরিকল্পনা। এ মুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বর দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে প্রস্তুত করেছেন। যিশুর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি জাতি, বংশ ও পরিবার অর্থাৎ পিতা-মাতা। ঈশ্বর মা হওয়ার জন্য মা মারীয়াকে এবং পিতা হওয়ার জন্য যুদা বংশের সাধু যোসেফকে মনোনীত করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর যিনি তাঁর জন্য। যাদের আদর, যত্ন, ভালবাসা, শিক্ষায় যিশু বড় হয়ে উঠেছেন এবং প্রস্তুত হয়েছেন তার প্রকাশ্য জীবনের জন্য। যার সমাপ্তিতে তিনি যন্ত্রণাভোগ করবেন, তাকে ক্রুশে দেয়া হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে শত্রুদের ক্ষমা করে ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিজের আত্মাকে পিতার হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। যিশু পিতার আশীর্বাদে আপন শক্তিতে মৃত্যুকে পরাজিত করে পুনরুত্থান করেছেন। মানুষের মুক্তির জন্য যিশুর মৃত্যু ছিল অবধারিত যদিও পিতা ঈশ্বর তার পুত্রকে জোর করেননি। কিন্তু যিশু পিতার বাধ্য হয়ে মানুষকে ভালবেসে মৃত্যু বরণ করেছেন।

পুনরুত্থানের পর যিশুর প্রৈরিতিক কর্ম: যিশু পনুরত্থানের পর যে প্রৈরিতিক কাজ করেছে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরা হলো। এ সময় যিশু শিষ্যদের সাথে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন এবং রুটি ভাঙ্গার অনুষ্ঠানও করেছেন।

মেরী মাগদালেনা যার মধ্য থেকে যিশু ৭টি অপআত্মাকে বিতাড়িত করেছিলেন যা (*মথি ১৬:৯ ও লুক ৮:২-৩ পদে*) বর্ণিত আছে। মেরী মাগদালেনা ছিলেন যিশুর শিষ্যদের, পরিবারের ও বন্ধুদের অন্যতম কাছের মানুষ। মাগদালেনা প্রথম মানুষ যিশু যার কাছে মৃত্যুর পর রবিবার দিন খুব সকালে পুনরুত্থিত রূপে দর্শন দিয়েছিলেন *(মার্ক ১৬: ৯-১১ এবং যোহন ২০: ১১-১৮ পদ)*।

একই দিনে বিকালে যখন দুইজন শিষ্য জেরুসালেম থেকে এম্মাউসের পথে যাচ্ছিলেন যা প্রায় ১২ কিলোমিটারের পথ সেই সময় হঠাৎ যিশু আশ্চর্যজনক ভাবে উদয় হয়ে তাদের সাথে পথ চলতে থাকেন। চলতে চলতে তিনি শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে যা যা লেখা ছিল এবং যা হওয়ার কথা ছিল তা তাদের ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে তিনি যখন রুটি হাতে নিয়ে তা শিষ্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন তখনই তারা বুঝতে পেরেছিল তিনি স্বয়ং পুনরুত্থিত যিশু *(মার্ক ১৫: ১২-১৩ পদ, লুক ২৪: ১৩ পদ)*।

সন্ধ্যা বেলায় সমস্ত শিষ্যরা যখন একটি বন্ধ ঘরে একসাথে ছিলেন (টমাস ব্যতিত) তখন পুনরুত্থিত যিশু তাদের দেখা দেন। প্রথমেই তাদের বলেন তোমাদের শান্তি হোক *(যোহন ২০:১৯ পদ)*। অন্যান্য শিষ্যদের কাছে যিশুর দর্শনের কথা শুনে তিনি বিশ্বাস করেন নি। টমাস বলেন যদি আমি যিশুর দুই তাতে পেরেকের দাগ না দেখি এবং বুকের পাশটিতে আঙ্গুল দিতে না পারি তবে কোন ভাবেই বিশ্বাস করবো না যে যিশু পুনরুত্থান করেছেন *(যোহন ২০: ২৫ পদ)*।

অবিশ্বাসী টমাসকে বিশ্বাসী করার জন্য যিশু পুনরায় শিষ্যদের দেখা দেন এবং বলেন টমাস আর অবিশ্বাসী হয়ে থেকো না। যিশুকে দেখে টমাস বলে উঠলেন 'ঈশ্বর আমার, প্রভু আমার'। যিশু বলেলন, তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছো, যারা না দেখে বিশ্বাস করে ধন্য তারা *(যোহন*

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

করোনাভাইরাস রূপান্তর হোক করুণার ভাইরাসে

ফাদার কমল কোড়াইয়া

'ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী'- বিশ্বজয়ী মিডিয়ার এ যুগে গর্বের সাথেই কথাটা বলা হত। 'গ্লোবাল ভিলেজ' (বিশ্ব-পল্লী) শব্দটাও ছিল মুখে মুখে। আধুনিকতার ভরা যৌবনে কথাটা একেবারে ফেলে দেবার মতও নয়। অনেক সময় পরিবার-পাড়া-প্রতিবেশীর খবর না জানা থাকলেও হাজার মাইল দূরে বসবাসরতরা প্রথমে খবরটা দিয়ে অবাক করে দেয়। অনেক সময় আবার নিজের তাগিদেই পাড়া-প্রতিবেশীর খবর বিদেশে বসবাসরতদের কাছ থেকে আমরা জেনে নিই।

তবে আসল বাস্তবতা হল-আধুনিকতার কল্যাণে যে কাছাকাছি থাকা, পাশাপাশি পাওয়া তা যেন নিছক আনুষ্ঠানিকতা। শুধুমাত্র কাছাকাছি দৈহিক অবস্থান। প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে কাছাকাছি, পাশাপাশি তেমনটা বলা যাবে না। যান্ত্রিক এ যুগে মানুষের সময় কাটে কম্পিউটারে, টেলিভিশনের সামনে, মোবাইল ফোনে, গবেষণাগারে বা অন্য কোন যন্ত্রদানবের সান্নিধ্যে। তাদের একটু থেমে কথা বলার সময় নেই। পুত্র-কন্যাকে আদর-সোহাগ করার ফুসরৎ নেই।স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা ভাববিনিময়ের সময় কোথায়?

এমনই সময়ে বিশ্বে হানা দিয়েছে ভয়ংকর করোনাভাইরাস ঘটিত কোভিট-১৯। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ প্রাণিটির আগ্রাসী আক্রমণে বিশ্ব আজ স্তব্দ। ঘরবন্ধ। আতঙ্কিত। অসহায়। বিশ্ববিখ্যাত বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকগণ আজ পথহারা। আজ পর্যন্ত কোন প্রতিষেধক ঔষধ তারা আবিস্কার করতে পারেননি। নেই কোন নিরাময়কারী ঔষধ। কোন নির্দেশনাই যেন করোনার আক্রমণ থেকে নিরীহ অসহায় মানুষ রক্ষা পাচ্ছেন না। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, পরিবার থেকে পরিবার, গ্রাম থেকে গ্রাম, শহর থেকে শহর, জেলা থেকে জেলা, এমন কি দেশ থেকে দেশের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করেও রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না এ মরণব্যাধির করাল ছোবল থেকে।

বর্তমান বাস্তবতায় অনেকের মনেই প্রশ্ন-করোনাভাইরাসের মতো পৃথিবীময় প্রাকৃতিক এ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কি আমাদের কিছু বলতে চাচ্ছেন? এ যুগলক্ষণগুলোর অর্থই বা কি? জটিল উত্তরগুলো নিয়েই আমাদের এ পর্যালোচনা।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২৭ মার্চ করোনাভাইরাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মহামারী মানবজাতির উপর ঈশ্বরের কোন শাস্তি বা বিচার নয়। বরং মানুষের কাছে কোনটা বর্তমানে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা সঠিকভাবে আবিষ্কার করার বিশেষ আহ্বান। তিনি সাধু লূক লিখিত পবিত্র মঙ্গলসমাচারে গালিল সাগরে যিশুর ঝড় থামানোর *(লূক ৮ঃ২২-২৫)* কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আসুন আমরা আমাদের নৌকায় যিশুকে আহ্বান করি। আমাদের সকল ভয়-ভীতি যিশুর হাতে সঁপে দিই। তিনি যেন আমাদের এ মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। পোপ মহোদয় আরও বলেন, করোনাভাইরাসে সৃষ্ট মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরে অসুস্থতা, মৃত্যু, গৃহবন্দী, স্কুল-কলেজ-কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়া যেন গালিল সাগরে ঝড়ে পতিত হওয়া শিষ্যদের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আমাদের চারিদিক, আমাদের শহর, রাস্তাঘাট সবই যেন আজ গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমাদের জীবনে যেন এক অন্ধকারে অবস্থান করছে। সব কিছু যেন নীরব-স্তব্দ। গভীর স্তব্দতা যেন আমাদের জন্যে অসহনীয় হয়ে উঠছে। আমাদের চারিদিকে তাকালেই যেন আমরা একধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। আমরা যেন একে অন্যের চোখে-মুখে এক ধরনের অসহায়ত্ব লক্ষ্য করছি। আমরা সকলেই যেন ভয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। আমরা যেন অসহায়ত্বের করাল গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসেছি। আমরা যেন অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছি। পোপ মহোদয় দৃঢ়তার সাথে বলেন, গালিল সাগরের প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে যিশুর উপস্থিতিতে শিষ্যদের মতো আমরাও নৌকাডুবির বিপর্যয় হতে রক্ষা পাবার অভিজ্ঞতা লাভ করব। কারণ আমরা বিশ্বাস করি পরম করুণাময় ঈশ্বরের মহাশক্তি যেখানে উপস্থিত সেখানে আমাদের জীবনে যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন আমরা তা থেকে রক্ষা পাবই। সকল মন্দতাই উত্তমতায় পরিণত হবে।

পোপ মহোদয় এ মহা সংকটকালে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, নদী নিজে তার জল পান করে না; গাছ নিজে তার ফল খায় না; সূর্য নিজের উপর তার আলো বিকিরণ করে না; ফুলও নিজের জন্য সুগন্ধ ছড়ায় না; অন্যের কল্যাণে নিজেকে সঁপে দেয়া প্রকৃতিরই নিয়ম। তিনি বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা সকলেই একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যেই জন্মেছি। যতই সমস্যা আসুক না কেন... আমাদের জীবন সুখের হয় তখন, যখন আমরা সুখী হই; অন্যকে সুখী করার জন্যে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করি। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আসুন আমরা অভিযোগ বা অনুযোগ নয়, আমাদের কষ্টগুলোকে আমাদের জীবিত থাকার একটি চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করি। এ চিহ্নগুলো আমাদের বুঝতে সাহায্য করে-সম্মিলিতভাবে আমরা শক্তিশালী। আমরা একা নই। আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনার একটি বিশেষ শক্তি আছে। আজ আমরা বিশ্ববাসী-ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আত্মীয়-অনাত্মীয়, দেশী-বিদেশী, দেশবাসী-শরণার্থী সকলেই নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এ মহা বিশ্ব সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করেন। করোনাভাইরাসের মরণছোবল থেকে রেহাই দেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আজ সচেতনতামূলক অনেক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আলোচনা-সমালোচনা, প্রস্তাব প্রকাশ পাচ্ছে। করোনাভাইরাস নিয়ে মিশরের একজন প্রাক্তন আইনপ্রণেতা লিখেছেন-করোনাভাইরাসকে তোমরা ঘৃণা করো না, এ ভাইরাস বিশ্বে মানবতা ফিরিয়ে এনেছে। মানুষকে তা সৃষ্টিকর্তার কাছে ও তাদের নৈতিকতায় ফিরিয়ে এনেছে। সুদের হার কমিয়ে এনেছে। ঘুষ নেয়া থামিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের একসাথে নিয়ে এসেছে। অশ্লীল আচরণ বন্ধ করেছে। মৃত-নিষিদ্ধ প্রাণী খাওয়া বন্ধ করেছে। সামরিক ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্যসেবাতে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেছে। পরিবারের সদস্যদের একসাথে প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছে। মানুষকে উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা স্থাপনে প্রয়াসী করেছে। স্বৈরশাসক ও তাদের

মানুষকে তা সৃষ্টিকর্তার কাছে ও তাদের নৈতিকতায় ফিরিয়ে এনেছে। সুদের হার কমিয়ে এনেছে। ঘুষ নেয়া থামিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের একসাথে নিয়ে এসেছে। অশ্লীল আচরণ বন্ধ করেছে। মৃত-নিষিদ্ধ প্রাণী খাওয়া বন্ধ করেছে। সামরিক ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্যসেবাতে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেছে। পরিবারের সদস্যদের একসাথে প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছে। মানুষকে উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা স্থাপনে প্রয়াসী করেছে। স্বৈরশাসক ও তাদের ক্ষমতাকে তুচ্ছ করেছে। কর্তৃপক্ষকে কারাবন্ধী ও দুর্বলের প্রতি নজর দিতে বাধ্য করেছে। মানুষকে শিখিয়েছে শিষ্টাচার।

ক্ষমতাকে তুচ্ছ করেছে। কর্তৃপক্ষকে কারাবন্ধী ও দুর্বলের প্রতি নজর দিতে বাধ্য করেছে। মানুষকে শিখিয়েছে শিষ্টাচার। শিখিয়েছে কি ভাবে হাঁচি-কাশি দিতে হয়, হাত ধুতে হয়। তিনি আরও লিখেছেন, করোনাভাইরাস আমাদের শিখিয়েছে ঘরে সময় কাটাতে, পারিবারিক জীবন মূল্য দিতে, প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতা করতে। আমাদের শিখিয়েছে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের পাপ-পঙ্কিলতার জন্যে ক্ষমা-মার্জনা চাইতে। করোনাভাইরাস আমাদের জন্যে এসেছে এক মহা শিক্ষা নিয়ে।

বিশ্বের এক নম্বর ধনী বিল গেটস করোনাভাইরাস নিয়ে একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক অনুধ্যান লিখেছেন যা আমাদের সবার জন্যেই অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি লিখেছেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ পৃথিবীতে যাই ঘটুক না কেন এর পিছনে সৃষ্টিকর্তার একটা উদ্দেশ্য নিহীত আছে। করোনাভাইরাস নিয়ে আমার একান্ত ব্যক্তিগত অনুধ্যান আপনাদের সাথে সহভাগিতা করছি।

ক. আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, পেশা, আর্থিক অবস্থা,খ্যাতি ইত্যাদি সব কিছুর পরও সৃষ্টি ও সত্তাগতভাবেই আমরা সকল মানুষ সমান। আমরা যত খ্যাতিবান বা ক্ষমতাশালী হই না কেন যে কোন সময় আমরা কঠিন সংকটে পড়ে যেতে পারি। মহা বিপদ আমাদের অসহায় করে দিতে পারে। এ বাস্তবতাটাই যেন করোনাভাইরাস খুব ভালভাবেই আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

খ. পৃথিবীর সকল মানুষই একজনের সাথে অন্যজন ভীষণভাবে সম্পৃক্ত। আমরা সবাই গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। দেশ বিভাগের সীমানাগুলো ছলনা ছাড়া কিছুই নয়। দেশ বিভাজনের সীমানাগুলো কত ঠুনকো তা এ ভাইরাসই আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। সীমানা পাড় হতে ভাইরাসের কোন ভিসা, পাসপোর্ট লাগে না। গোটা পৃথিবীটাই এখন করোনাভাইরাসের দখলে।

গ. করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্যে ঘরে থাকাটা যদি আমরা বন্দীদশা মনে করি তবে একটু গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করে দেখি- যারা আজীবন বন্দী অবস্থায় আছে তাদের জীবনটা কেমন? আমরাতো আমাদের সুস্থ রাখার জন্যেই ঘরে আছি। তাই না?

ঘ. আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা করোনাভাইরাস আমাদের ভালমতই শিখাছে। আমাদের স্বাস্থ্যটা আমরা কতইনা অবহেলা করি। নানা রকম কেমিক্যালজাত খাদ্য, খাদ্যে ভেজাল, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসহ আরও কতইনা স্বাস্থ্যের প্রতি অনাচার আমরা করে থাকি। করোনাভাইরাস আমাদের শেখাছে-আমাদের স্বাস্থ্যের যত্ন আমাদেরই নিতে হবে। না নিলে এ মহাবিপদে আমাদেরই পড়তে হবে।

ঙ. করোনাভাইরাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমাদের জীবনটা এ পৃথিবীতে কতইনা ক্ষণস্থায়ী। যে কোন সময়, যে কোন বয়সে আমাদের চির বিদায় নিতে হতে পারে। তাই শিশু ও বয়স্কদের আমাদের বেশী করে যত্ন নিতে হবে। তাদের সুরক্ষা আমাদেরই করতে হবে। সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় শিশুরা পৃথিবীতে আসে আর তাঁরই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে বয়স্করা পরপারে চলে যান। তাই আমাদের জীবনটাকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

চ. আমাদের জীবনের সংকটময় অবস্থায়ই আমরা আবিষ্কার করতে পারি- আমাদের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো কি। খাদ্য, জল ও ঔষধ হল আমাদের পার্থিব জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। দামী বাড়ী-গাড়ী, ধন-দৌলত কিছু তখন আর কাজে লাগে না। আমাদের সুস্থ্য রাখতে পারে না।

> করোনাভাইরাস আমাদের শিখিয়েছে-ভয় নয় আমাদের সাবধান হতে হবে। পৃথিবীতে অতীতেও এমন অনেক সংকট এসেছে। কোন সংকটই চিরস্থায়ী হয়নি। জীবন চলতেই থাকবে। আকাশে মেঘের পরই সূর্য-আলো ফিরে আসে। আমাদের আবার সুদিন ফিরে আসবে। আমরা আবার নতুন চেতনা ও অভিজ্ঞতায় এগিয়ে যাব। নতুন পৃথিবী আমরা গড়ে তুলব।
>
> মানব সভ্যতার প্রতি করোনাভাইরাসের সবচেয়ে বড় করুণা হল- বর্তমান মানব সভ্যতাকে সে শিখিয়েছে- সাবধান না হলে মানব জাতির কত বড় ক্ষতি হতে পারে। পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা বৃদ্ধি না করলে আগামীতে পৃথিবীর আরও কত বড় ক্ষতি হতে পারে- তাও করোনাভাইরাস আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ছ. করোনাভাইরাস আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে-আমাদের পরিবার-প্রিয়জনদের আমরা কত অবহেলা করি। অনেক সময়ইতো আমরা ঘরে ফিরতে চাই না, পরিবার-পরিজনদের সময় দিই না, একসাথে খাবার-দাবার গ্রহণ করি না, রোজা-প্রার্থনা করি না। করোনভাইরাস আমাদের এক সাথে থাকতে বাধ্য করছে। আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় করছে। আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাসী করে তুলছে।

জ. সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি, পাশে থাকি। আপদে-বিপদে একে অন্যকে সাহায্য করি, রক্ষা করি। করোনাভাইরাস তা করতেই আমাদের বাধ্য করছে।

ঝ. পৃথিবীটা ক্ষণস্থায়ী। ক্ষমতা, অর্থবিত্ত, যশ:-খ্যাতি কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যে কোন সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। অতি ক্ষুদ্র এ ভাইরাস আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে যেন বিষয়টি দেখিয়ে দিয়েছে। আমরা কত অসহায়। তাই আমাদের সব ধরনের পার্থিব লোভ-লালসা, অহংকার, ক্ষমতা ও অর্থবিত্ত ব্যবহারে আরও দায়িত্বশীল হতে করোনাভাইরাস আমাদের সহায়তা করছে।

ট. সৃষ্টিকর্তা আমাদের স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের নিজের উপরই নির্ভর করে- আমরা ভাল হবো বা মন্দ হবো। স্বার্থপর হবো বা পরার্থপর হবো। ভালোবাসব, না ঘৃণা করব। সাহায্য করব, না নির্যাতন করব। দান করবো, না ছিনিয়ে আনব। সমবেদনা দেখাব, না নিপীড়ন করব। সংকট আমাদের আসল চেহারা প্রকাশ করে। করোনাভাইরাস আমাদের মানবতার বর্তমান বাস্তবতা বুঝতে সহায়তা করছে।

ঠ. করোনাভাইরাস আমাদের নম্র হতে শিখিয়েছে। পৃথিবীটা উত্তমভাবে ব্যবহার করতে আমাদের সচেতন করে দিচ্ছে। প্রকৃতির সুরক্ষা, সম্পদের উত্তম ব্যবহার ও বৈশ্বিক সম্পদ ভাগাভাগি করে সুষম জীবন ও মানবতার জয়োগান করতে করোনাভাইরাস আমাদের সজাগ করে দিয়েছে।

ড. করোনাভাইরাস আমাদের শিখিয়েছে-ভয় নয় আমাদের সাবধান হতে হবে। পৃথিবীতে অতীতেও এমন অনেক সংকট এসেছে। কোন সংকটই চিরস্থায়ী হয়নি। জীবন চলতেই থাকবে। আকাশে মেঘের পরই সূর্য-আলো ফিরে আসে। আমাদের আবার সুদিন ফিরে আসবে। আমরা আবার নতুন চেতনা ও অভিজ্ঞতায় এগিয়ে যাব। নতুন পৃথিবী আমরা গড়ে তুলব।

ঢ. মানব সভ্যতার প্রতি করোনাভাইরাসের সবচেয়ে বড় করুণা হল- বর্তমান মানব সভ্যতাকে সে শিখিয়েছে- সাবধান না হলে মানব জাতির কত বড় ক্ষতি হতে পারে। পারস্পারিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা বৃদ্ধি না করলে আগামীতে পৃথিবীর আরও কত বড় ক্ষতি হতে পারে- তাও করোনাভাইরাস আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের করুণা সর্বগ্রাসী করোনাভাইরাসের চেয়ে আরও লক্ষ কোটিগুণ শক্তিশালী। তিনি অতীতে আরও অনেক মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। তিনি এবারও আমাদের রক্ষা করবেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, করোনাভাইরাস যদি ঝড় হয়, তাহলে এই ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আমরা সবাই একই নৌকায় রয়েছি। আমাদের এক সঙ্গে লড়াই করতে হবে। বিখ্যাত ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার বলেছেন, আমরা একদল, লড়াই একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। যিশু নিজেই বলেছেন, তোমরা দুই বা তিনজন মিলে যেখানে প্রার্থনা করবে, আমি সেখানেই তোমাদের সাথে আছি। আসুন আমরা পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে করজোরে অনুনয় করি তিনি যেন আমাদের সকলকে সুরক্ষা দান করেন। পরম করুণাময় স্বর্গস্থ পিতার করুণায় আমরা জগত বিনাসী করোনাভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাবই- এ শুধু আমাদের বিশ্বাসই নয়, সন্তান হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের অধিকার॥ ❑

পরিবারে মানবতার গঠন, চর্চা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট:

পরিপ্রেক্ষিত ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর পরিবার

ফেলিক্স বাবলু রোজারিও

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি জন্ম নিয়ে ছিলেন এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। শান্ত স্রোতস্বিনী ইছামতির কোল ঘেঁষে গড়ে উঠা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আঠারোগ্রাম অঞ্চলের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর হাসনাবাদ গ্রামে, বাবা নিকোলাস কমল গাঙ্গুলী ও মা রমনা কমলা গাঙ্গুলীর পরিবারে। পরিবারে তিন ভাইয়ের মধ্যে থিওটোনিয়াস ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। ছোটবেলা থেকেই থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর পড়াশুনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবারে বেড়ে ওঠা থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মানবতার মুলমন্ত্রের পাঠ শুরু হয় তাঁর মায়ের কাছে। মা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিকা নারী। সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত প্রার্থনা এবং গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছিল তাদের পরিবারের এক বিশেষ রীতি। মায়ের সাথে তিন ভাই মিলে প্রতিদিন সকালের খ্রিস্টযাগে যোগদান করতেন। ঝড়, বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাকে খ্রিস্টযাগে যোগদান থেকে বিরত রাখেতে পারতো না। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে সেবক হওয়াই ছিল তার নিত্য দিনের প্রথম ও প্রধান কাজ। সকলের প্রতি সুন্দর বিনম্র ব্যবহার, গুরুভক্তি, স্বভাবসুলভ সরলতা এবং সুমধুর কণ্ঠশৈলীর জন্য তাকে অন্য সব বালকের থেকে অনন্য একজন করে তুলেছিল। শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ (সিএসসি) একবার ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণে তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ক্লাসে কখনোও দ্বিতীয় হননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি খেলাধূলা, আবৃত্তি, গান, নাট্যাভিনয়ে খুব পারদর্শী ছিলেন"। মানবতার মহান গুনাবলীর চর্চা সেই ছোটবেলাই প্রকাশ পায় ছোট্ট থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর অন্তরে। ক্লাসে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের তিনি নিয়মিত পড়াশুনায় সাহায্য করতেন, যাতে তারা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে, ভাল মানুষ হতে পারে। অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার অদম্য বাসনা সেই ছোট বেলা হতেই তাঁর মনে এক গভীর জায়গা করে নিয়ে ছিল। যা সময়ের হাত ধরে পুষ্প পল্লবে বিকশিত হয়েছে সহস্রধারায়।

জীবিকার প্রয়োজনে তাঁর পিতা নিকোলাস কমল গাঙ্গুলী কোলকাতায় চাকুরী করতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা সীমাবদ্ধতা, অভাব-অনটনের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠার মধ্যেও তাঁর মাতা রমনা কমলা গাঙ্গুলী প্রার্থনায় ছিলেন অবিচল। প্রতিদিন তিনি সন্তানদের নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন এবং সন্তানদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত সচেতন করতেন, পরামর্শ দিতেন। পরিবারে বাবার অনুপস্থিতিতে মায়ের নিকট হতে এই আদর্শ, শিক্ষা এবং তার জীবনাচরণ শিশু থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে ধীরে ধীরে তিনি ঈশ্বেরের প্রতি এক সুগভীর টান অনুভব করেছিলেন। তাঁর অন্তরের মধ্যে শতধারায় উৎসারিত হতে থাকে সকল মানবতার গুনাবলী, যা তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, ধার্মিক, প্রর্থনাশীল, শান্ত ধীর। ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সরলতা এবং পবিত্র শান্ত সৌম্য স্বভাব ছিল তার চরিত্রের এক অনন্য মুকুট।

বর্তমান সময়ে আমরাও আমাদের পারিবারিক জীবনে এই মহান খ্রিস্টীয় পরিবারের আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। তারা যেমন মধ্যবিত্ত পরিকাঠামোর সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যদিয়ে সংগ্রাম করেছেন। সন্তানদের প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মানবতার সেবায় সন্তানদের দীক্ষিত করেছেন এবং সফল হয়েছেন। আমরাও আমাদের পারিবারিক জীবনে সন্তানদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের আদর্শে দীক্ষিত করেতে পারি, ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর নাজারেথের ক্ষুদ্র পরিবারের মতো। আমরা জানি বর্তমান সময়ে আমাদের পরিবারিক জীবনে বহুবিধ সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় অবিচল থেকে আমরা আমাদের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবলায় সচেষ্ট হতে পারি। ঈশ্বর কখনই তার ভক্তের মিনতি অগ্রাহ্য করেন না, সময়ে তিনি ভক্তের পরীক্ষা নেন মাত্র। ভক্তির নৈবেদ্যের থালা শুণ্য হলে ভক্তের নয় ভগবানই অস্তিত্বের সংকটে পতিত হন। তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে। আমায় নইলে ত্রিভূবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে"। বর্তমান সময়ে সন্তানদের নানাবিধ চাহিদা পিতা-মাতাকে অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থায় ঠেলে দেয়, কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি করে। পিতা-মাতা হিসাবে শুধুমাত্র কঠোর শাসনে নয়, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পরম বন্ধুর মত পরিবারের সামর্থ্য এবং সন্তানদের চাহিদার মধ্যে বাস্তব সম্মত একটি ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকৃত মানুষ হিসাবে সন্তানদের গড়ে তোলার জন্য আমরা প্রচেষ্টা নিতে পারি। পিতা-মাতা হিসাবে সন্তানদের সামনে ভালবাসার আদর্শ, পরস্পরকে ক্ষমা, সততার চর্চা, সৎ-চিন্তা, পরচর্চা নয়, সকল ন্যায়/শুভ কাজে সন্তানদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সঠিক মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করতে পারি।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এই সময়ে আমরা এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। চারিদিকে শুধু নম্বরের জয়ধ্বনি, গ্রেডপয়েন্টের আস্ফালন। যেখানে জ্ঞানের গভীরতা নেই, মনুষ্যত্ব পরিমাপের কোন পন্থা নেই, মুক্ত চিন্তার কোন মাপকাঠি নেই। জ্ঞানহীন নম্বরের আধিক্য নিয়ে একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠছে এক বিচিত্র ভয়ংকর প্রতিযোগিতায়। যা ক্রমশ পরিবার তথা সমাজেকে অসুস্থ করে তুলছে, ভারসাম্যহীন করে তুলছে, মানবিকতার মূল্যবোধ নয় শুধুমাত্র অর্থ ও ক্ষমতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তাই শুধুমাত্র নম্বর নয়, গ্রেডপয়েন্ট নয়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে পিতা-মাতা হিসাবে আমরা যেন আমাদের সন্তানদের আদর্শ হতে পারি এবং পাশে দাঁড়াই। পড়াশুনার জন্য অহেতুক চাপাচাপি নয়, অন্য পরিবারের সন্তানদের সাথে তুলনা নয় বরং সন্তানদের সুকোমল হৃদয় বৃত্তি বিকাশে, মানবিকতার পাঠ প্রদানে এবং আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য সাধ্যমত সঙ্গীত চর্চা, আবৃত্তি, খেলাধূলা, ছবিআঁকা এবং নাট্যাভিনয়ের মত সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় তাদের উৎসাহিত করি এবং পারিবারিক পর্যায়ে তার ক্ষেত্র তৈরি ও চর্চা অব্যহত রাখি। পিতা-মাতা হিসাবে আমরা আমাদের অবস্থানে থেকে ছোটবেলা হতে সন্তানদের মিতব্যায়ী হওয়ার উপায় ও উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারি, অল্পতে সন্তুষ্ট থাকার আনন্দ সম্পর্কে সহভাগিতা করতে পারি এবং জীবনের সুখ-দুঃখ অপরের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার মন্ত্র শেখাতে পারি। শুধুমাত্র পাওয়া নয় বরং ত্যাগেই প্রকৃত আনন্দ এই মহান সত্য যেন আমাদের সন্তানেরা উপলব্ধি করতে পারে। তবেই এই ভয়ংকর একা বড় হওয়া স্বপ্ন নয়, বরং সকলকে নিয়ে একসাথে বহুদূরে এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্রে সন্তানেরা উজ্জীবিত হবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই মূল্যবোধ নিয়ে আবার গড়ে উঠবে পরিবার, সমাজ এবং দেশ।

একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে এই কৃপা আশীর্বাদ আমাদের দান করুন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বাংলার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে পরবর্তী ধাপ 'ভক্তিভাজন' (VENERABLE) হিসাবে মনোনিত করুণ এই হোক আমাদের সকলের আন্তরিক প্রার্থনা॥ ❑

পাস্কা ডিম্ব!

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

ঘোড়ার ডিম বা অশ্ব ডিম্ব কথাটি আমাদের সকলের কাছেই বেশ পরিচিত। আমরা কোন অবিশ্বাস্য, অবাস্তব, অলিক ব্যাপার বুঝাতে যখন তখন 'ঘোড়ার ডিম' কথাটি বলে থাকি। কিংবা যা নিতান্তই হবার নয় এমন কোন সম্ভবনার কথা কেউ বললে আমরা 'অশ্ব ডিম্ব' শব্দ দুটি ব্যবহার করে তা তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দেই। কিন্তু পাস্কা ডিম্ব! বা পুনরুত্থান ডিম (Easter Egg) এই শব্দের সঙ্গে আমরা কি আদৌ পরিচিত? আমার মনে হয় না যে, আমরা ইস্টার ডিমের সঙ্গে ততটা পরিচিত। আমাদের মধ্যে এমন কোন মানুষ আছে কিনা যে, যিনি ইস্টারের কথা বললে, তার চোখে ভেসে উঠে কোন ডিম বা ডিমাকৃতির কোন কিছু। তা না হয়ে বরং এমনটাই হয় যে, ইস্টারের কথা মনে হলেই আমাদের জিহ্বা ভিজে উঠে, আর চোখের সামনে ভেসে উঠে দই আর নানা রকমের মিষ্টি, সন্দেশ, মুড়ি আর কলা, এইতো, আর এই ধরনের কিছু রকমারী খাবারের কথাই মনে আসে। কিন্তু পাস্কা বা ইষ্টার ডিম? কি জা-নি, এর কথা শুনছি কি না? শুনে থাকলে থাকতেও পারি! হয়তো কদাচিৎ শুনেছি, কিংবা শোনার পর বুঝে উঠার আগেই কান ঘেঁষে উড়ে চলে গেছে। শুনছি কিনা ঠিক মনেও পড়ে না বা শুনে থাকলেও ভুলে গেছি। তেমন করে পাত্তা দেই নি। পাত্তা দেবার মতো কিছু নয়ও বটে।

পাস্কা ডিম্ব বা ইস্টার ডিম নিয়ে আমার নিজেরও কোন ধারণা ছিল না, এখন আছে তাও জোর দিয়ে বলা যাবে না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ডিমের উপর নানা কারুকাজ লক্ষ্য করেছি। শো' কেইস এর ভিতরে বসে নিজের সাজ-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করতে দেখেছি। আর এগুলি নিছক সো' পিসই ভেবে নিয়েছি। নিগুঢ় কোন অর্থ খুঁজতে যাইনি কখনো। কিংবা এর সঙ্গে ইস্টারের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে চিন্তায়ও আসেনি। খুব সম্ভব ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পুণ্য সপ্তাহের এক সকালে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর খাবার ঘরে নাস্তার টেবিলে আমরা তিন ফাদার আছি এই সময় পারারটেক থেকে কততংনে সিস্টারগণ আসেন ইস্টারের উপহার নিয়ে। তাদের হাতে সুদৃশ্য একটা ছোট্ট ঝুড়িতে তিনটি কারুকার্য খচিত ডিম। ইস্টারের এই উপহার দেখে আমি তো খুবই অবাক হলাম। সিস্টারগণ দেরী করলেন না, চলে গেলেন। হয়তো অন্যান্য ধর্মপল্লীতেও একই উপহার দিতে যাবেন। তারা চলে গেলে আমি ডিমগুলি নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম। এগুলি কি সত্যিই ডিম, নাকি ডিমের খোসা? নাকি অন্য কিছু দিয়ে তৈরী ডিম্বাকৃতি কিছু? কৌতুহল হচ্ছিল এ সিদ্ধ ডিম নাকি কাঁচা ডিম? কিন্তু এত সুন্দর চিত্রাঙ্কন দেখে আর ভেঙ্গে ভেদ করা হল না এগুলির ভিতরের রহস্য। ডিমের রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে যে দু'বছর ছিলাম। পাল-পুরোহিত ফাদার আবেলের আইডিয়া ও অনুপ্রেরণায় প্রত্যেক বছর পুনরুত্থান রবিবারে আমরা সেবক-

সেবিকাদের নিয়ে পাস্কা ডিম্ব বা ইস্টারের ডিম খেলার আয়োজন করতাম। ইস্টারের বিকালে সকল সেবক-সেবিকাদের আসতে বলতাম। তারা আসার আগেই একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে অনেকগুলি ডিম সিদ্ধ করে লুকিয়ে রাখতাম। তারপর প্রতিযোগিদের নির্দেশনা দিয়ে এবং সময় বেঁধে দিয়ে ডিম খুঁজতে দিতাম। নির্দিষ্ট সময় পর সব চেয়ে বেশী ডিম খুঁজে পাওয়া দশজনকে বিশেষ পুরস্কার দিতাম। এবং যারা কোন ডিম খুঁজে পায়নি তাদেরকে, যারা বেশী পেয়েছে তাদের মধ্য থেকে ভাগ করে দিতাম। যাতে করে সকলেরই হাতে কম পক্ষে ১/২টা ডিম থাকে এবং বিজয়ীদের হাতে ডিম ও পুরস্কার উভয় থাকে। ইস্টার ডিমের এই প্রতিযোগিতা উৎসব খুবই অল্প সময়ের সামান্য আয়োজন। কিন্তু তা নিয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত। ইস্টারের দিন বিকালে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বলতে গেলে সবাই হাজির হয়ে যেত। এ যেন শুধু ডিম খোঁজার প্রতিযোগিতা নয়, কিন্তু ইস্টারে এক ভিন্ন রকম আনন্দ করারও প্রতিযোগিতা।

একেবারে আক্ষরিক অর্থে ডিমের সঙ্গে পুনরুত্থান উৎসবের কোন সংযুক্ততা আছে কি না, তা আমার জানা নেই। তবে রূপক অর্থে অবশ্যই আছে, এবং ইস্টার ও ডিমের অনেক ব্যাখ্যা, অনেক গল্প-কথাও আছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই পুনরুত্থান উসবের এই সময় ডিম নিয়ে নানা খেলা হয়। বিশেষ করে শিশুদের আনন্দ উৎসবে মাতিয়ে রাখার জন্য ডিম ডিম উৎসবের আয়োজন হয়। ইউরোপের অনেক দেশে (ইতালী, ফ্রান্সে...) ডিম আকৃতির ছোট, বড় নানা আকারের চকলেট ইস্টার মৌসুমে বাজারে পাওয়া যায়। সেই ডিম আকারের চকলেট সবাই কিনে এবং শিশুদের জন্য তা উপহার হিসাবে দেয়। এই বিশাল বিশাল কিংবা ছোট আকারের চকলেট ডিমের ভিতরে আবার থাকে ছোট্ট একটা প্লাষ্টিকের ডিম আকারের কৌটা যেখানে থাকে বিশেষ গোপন উপহার। আর সেই কারনেই শিশুরা এই চকলেট ডিমের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্টি হয়। এই ডিম চকলেট পাওয়া মাত্রই তাই শিশুরা গোপন উপহারের জন্য কৌতুহলী হয়ে তাড়াতাড়ি তা ভেঙ্গে ফেলে। অনেক সময় এত এত চকলেট ডিম এক সঙ্গে ভাঙ্গাতে দেখে বাবা মায়েরা বিরক্ত হয়ে বলে সব গুলি এক সঙ্গে ভাঙ্গতে হবে না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কৌতুহল তো আর দমন করা যায় না। অনেক পিতামাতাগণ রঙ্গিন বা সাদা কাগজ বা অন্য কিছু দিয়ে ইস্টার উপলক্ষে ডিম তৈরী করে তার উপর সুন্দর করে নানা চিত্র অংকন করে, সাজায় আরো নানাভাবে এবং সেই ডিমের ভিতরে শিশুদের জন্য উপহার লুকিয়ে রাখে। শিশুদের অনেক স্কুলেও একইভাবে ইস্টার উপলক্ষে অদ্ভুত এই ডিম উৎসবের আয়োজন চলে। কৌতুহলী শিশুরা সেই উপহার পেয়ে হতবাক হয়ে যায়, আনন্দে দিশা হারা হয়ে পড়ে। এ যেন বড়দিনের সান্তাক্লুসের বিকল্প, পাস্কা ডিম্ব।

কেন ইস্টার ডিম বা পাস্কা ডিম্ব! ডিম একটি অতি সুস্বাদু খাবার। শহরের রাস্তায়, বাস ষ্টেশন, ফেরী ঘাটে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করতে দেখা যায়। ফেরীওয়ালারা হাক দিয়ে ডাকে, এই ডিম, গরম ডিম, ডিম লাগব? হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, কোয়েল পাখির ডিম, ইত্যাদি। ডিমের বাইরে শক্ত আবরণ থাকায় ধূলা বালি ভিতরে যায় না বলে,

অনেকেই নিরাপদ মনে করে লবণ আর গুড়া মরিচ মাখানো ডিম পথের মধ্যে আয়েশ করে খায়। অন্য যে কোন খাবারের চেয়ে ডিম দিয়ে নানা সুসাদু খাবার অতি সহজে ও অল্প সময়ে প্রস্তুত করা যায়। বাড়ীতে হঠাৎ অতিথি এলে অন্য কিছু না থাকলেও শুধু ডিম থাকলেই সব কুল রক্ষা হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে- ডিম তো শুধু ডিম নয়! ডিমের মধ্যে আছে অমিত সম্ভাবনা। ডিম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলে। কারণ এই ডিমের মধ্যেই রয়েছে উর্বরতা, যা থেকে ফুট ফুটে বাচ্চা মুরগীর (বা অন্য পাখি...) জন্ম হয়। তাই মুরগীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নির্ভর করছে এই ডিমের উপরই। ডিম যেমন ২১ দিনের তাপের পরে তার খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে বাচ্ছা, জন্ম হয় একটি নতুন সম্ভবনাময় দিনের, শুরু হয় আরো একটি নতুন প্রজন্মের পদাচারণা, পৃথিবীর বুকে চলে নতুন জীবনের দাপাদাপি। নতুন জীবনের এই উন্মেষে ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার দরজা, জানালা খুলতে শুরু করে। তেমনি যিশু তিন দিন তিন রাত কবরে থেকে, কবরের শক্ত খোলস ভেঙ্গে মানব জাতির জন্য উন্মুক্ত করলেন পরিত্রাণের নতুন দুয়ার। পাপ কলঙ্কের যে কঠিন আবরণ মানব জাতিকে মৃত্যু ডিমে (কবরে) বন্দী করে রেখে ছিল। যিশু সেই ডিমের শক্ত খোলস ভেঙ্গে বের করে আনলেন লুকিয়ে থাকা মহা মূল্যবান গোপন উপহার। গোটা মানব জাতির পরিত্রাণ।

ডিমের বাইরে নয় ভিতরে হল এর আসল ক্যারিশমা। ডিম হল উবর্রতার প্রতীক, নব জীবনের প্রতীক। ডিমের খোলস বা খোসা ভেঙ্গেই হয় সেই নব জীবনের সূচনা। আস্ত একটি ডিম যখন ভাঙ্গা হয় তখনই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে নতুন জীবনের আহবান। তাই কোন আস্তরণের ভিতর জীবন থেমে বা লুকিয়ে থাকে না। তা আলোতে বেরিয়ে আসে আর নিজের জীবনের আলোকছটা, সজীবতা ছড়িয়ে দেয় সবখানে। যিশু যিনি জীবনের উৎস, তিনি কি আর কবরের তমসায় আবদ্ধ থাকতে পারেন? তিনি তাঁর অভূতপূর্ব জীবন আলোক নিয়ে আধাঁর ফোঁড়ে উত্থিত হলেন। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষের পরিত্রাণের পথে যে পাপের শৃঙ্খলের বাঁধার খোলসে ঢাকা ছিল তা ভেঙ্গে চূড়মার করে দিয়েছেন। তিনি অন্ধকার আচ্ছন্ন কবরের রুক্ষ পাথর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে প্রজ্বলন করেছেন পুনরত্থানের মহা আলোক জ্যোতি। তাই ডিম ফেঁটে যেমন ফুট ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে এসে নতুন জীবনের পথে হাঁটে; প্রভু যিশু তেমনি মানুষের চার পাশে থাকা পাপের অন্ধকারাচ্ছন্নতা ছিড়ে দিলেন, তিনি পুনঃউদ্ধার করলেন অনন্ত জীবনের মহিমালোকের প্রবেশ দ্বার। ঈশ্বর ও মানুষের মহামিলনের, মহা আনন্দের স্বর্গ ধাম॥ ❑

আমি উত্তম

ভেলোরিনা সরকার

"মহান ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান আমি,
নিজের অহংকারে নেহাৎ তুচ্ছ হই আমি;
উত্তম আমি তাঁর পরিচয়ে,
প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, জ্ঞান করিল দান এই দিবালয়ে।"

'উত্তম' শব্দটির অর্থ বলতে সাধারণত বুঝি, কোন কিছু আমাদের দৃষ্টিতে ভালোর উর্ধ্বে স্থান গ্রহণ করাকে। এই শব্দটি শুধু যে ভাবার্থ প্রকাশেই ব্যবহৃত হতে পারে তা নয়। এই ক্ষুদ্র শব্দটি আমাদের পরিচয়ের চিহ্নও হতে পারে। স্বয়ং ঈশ্বর ভগবান, যিনি সকল সৃষ্টির উৎস, তিনিই তা প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির সমাপ্তিকালে তিনি বলেছিলেন, "সবই উত্তম হয়েছে"। তিনি নিজেই তাঁর সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাই আমি! আমরা যে উত্তম তা বলাটা আমাদের গর্ববোধ হবে না। বরং নিজেদেরকে উত্তমতার পথে একধাপ এগিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে। অবশ্য এটি লক্ষ্যণীয় যে, আমি উত্তম বলে যখন অন্যের জ্ঞান, ধারণা বা চিন্তাকে তুচ্ছ করি, তখনই আমি অহংকারের পরিচয় বাহক হয়ে উঠি। আর একজন অহংকারী ব্যক্তি কখনও ঈশ্বরের আপনজন হতে পারে না। ঈশ্বর নিজেই উত্তম। আর তাঁর উত্তমতার প্রকাশ হল তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট আমরা। তাঁর এই পরিচয়ের ধারক আমরা তখনই হব যখন আমরা তাঁর সকল দানের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও সমস্ত সৃষ্টির প্রতি আমাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে প্রকাশ করব। আমাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম মহত্বের লক্ষ্যে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে এক হয়ে ওঠে তখনই যেন পবিত্র ঐশ ভালোবাসা আমাদের মধ্য দিয়ে জগতের দীন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পরে। আর আদিতে সৃষ্টির সমাপ্তিলগ্নে ঈশ্বরের বাক্যের ন্যায় তখন আমরা উত্তম হয়ে উঠি।

ঈশ্বর আমাদের অনেক ভালোবেসে, অনেক যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। তুচ্ছ হবার জন্যে নয় বরং ঈশ্বরের উত্তমতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরিচয় হয়ে ওঠার জন্যে। আমরা সকলে তাঁর পরিচয়, তাঁর উত্তরাধিকারী। তাই বলা যেতে পারে যে, উত্তমতা ঈশ্বরের প্রদত্ত একটি আহ্বান, তাঁর মত হয়ে ওঠার। যেমনটি স্বয়ং খ্রিস্ট হয়ে উঠেছিলেন পিতার ইচ্ছাকে নিজের করে নিয়ে। এটি যেন পবিত্র ত্রিত্বে যোগ দেবার আহ্বান। উত্তম শব্দটির প্রকৃত অর্থ তখনই আমরা বুঝতে পারব যখন আমরা নম্রতাকে ধারণ করব। একদিকে উত্তমতার স্বীকারোক্তি অন্যদিকে নম্রতার পরিচয়, দু'টি যেন পারস্পরিক বিপরীতার্থক সম্পর্কের আভাস দেয়। কিন্তু উভয় বিপরীতার্থক দু'টি ধারণার মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন স্বয়ং খ্রিস্ট। তিনিই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ উত্তমতা ও নম্রতার মাঝে। তিনি ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও মানুষরূপে এই পাপময় জগতে জন্ম নিলেন। উর্ধ্ব থেকে নিম্নে নেমে এলেন। এটি তাঁর নম্রতার বৃহৎ একটি উদাহরণ। দীন জীবনকে বেছে নিলেন, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মানুষকে আপন করে ভালোবাসলেন এবং সমগ্র ধরণীকে ভালোবাসতেও শিখালেন। সকল অপমান, লাঞ্ছনা, কষ্ট নত শিরে মেনে নিলেন। এমন কি ক্রুশের উপরে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। নম্রতার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে পিতার কাছে নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন। এরই মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের উত্তম মেষপালক হয়ে উঠলেন।

সর্বকালের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন তিনি। তাঁর এই নম্রতার পুরস্কারস্বরূপ পিতা ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত খ্রিস্টরূপে স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোকের উর্ধ্বে উন্নীত করেছেন। তাই পুনরুত্থানকালের আনন্দমুহূর্তে খ্রিস্ট যেন আমাদের বার বার ডাকছেন আমরা যেন তাঁর মত নম্র হয়ে তাঁকে অনুসরণ করি। আমাদের বর্তমান কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নেই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি। তাহলেই ঈশ্বর আমাদের উপর প্রীত হবেন। আমরা হয়ে উঠতে পারব তাঁর উত্তম সন্তান।

জীবন যুদ্ধে খ্রিস্টকে অনুসরণ করে আমাদের এই যাত্রা হোক উত্তমতার পথে যাত্রা। পরিশেষে একজন আদর্শবান ব্যক্তির অনুপ্রেরণামূলক উক্তি দিয়ে শেষ করছি:

" আমি উত্তম, আমি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপহার,
এবং আমার দ্বারা সমস্ত কিছুই সম্ভব।" ❑

নোভেল করোনাভাইরাসের কঠিন বাস্তবতায় এবারের পুনরুত্থান পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

"সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর" পুনরুত্থান বিশেষ সংখ্যার জন্য আমি যখন লেখাটি লিখতে বসেছি ঠিক সেই সময় প্রায় পুরো বিশ্বেই ভয়ংকর করোনা বা কোভিড ১৯-এর আক্রমণে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমার লেখাটি যখন ছাপা হবে বিশ্বাস করতে চাই তখন হয়তো এর তীব্রতা কমে আসবে। করোনাভাইরাসের বর্তমান বাস্তবতায় এবারের পাস্কা পর্ব পালন বিশেষ তাৎপর্য বা গুরুত্ব বহন করে। পাস্কা পর্ব পালন ও করোনাভাইরাসের বাস্তবতাকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রেরণা আমাদেরকে করোনাভাইরাসের সংকট মোকাবেলায় সাহায্য করে, শক্তি যোগায়। কারণ পাস্কা পর্ব পালন করে আমরা আমাদের জীবনে নতুন আলো, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন জীবন লাভ করি। করোনা ভাইরাসের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে যিশুর পুনরুত্থান আমাদের কি বার্তা বা শিক্ষা দেয়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের পাস্কা পর্ব পালন যতদিন বেঁচে থাকব আমাদের স্মরণে বা মনে থাকবে। আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার মনে হয় এরকম পরিস্থিতিতে এর আগে আমরা আর কখনো পড়িনি এবং প্রার্থনা করি ভবিষ্যতে যেন আর পড়তে না হয়।

সত্যি কোভিড ১৯, করোনাভাইরাসের কারণে পৃথিবীতে আমরা আজ বড় বিপন্ন বোধ করছি। আমরা সকলে ভয়ে আতংকিত বা শংকিত। পৃথিবীর প্রায় এমন কোন দেশ নেই, যারা এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত না, এটাকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছে না। এই ভাইরাসটি ধনী-গরীব, শ্রেণী, পেশা, জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আক্রমণ করছে। পৃথিবী সত্যিই আজ থমকে গেছে। সবকিছুই যেন স্তবির হয়ে পড়েছে। নিজেদেরকে আমরা ঘরে বন্দি করে রেখেছি। অনেক দেশ আজ মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে। মৃত্যু ভয় যেন আমাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আর এভাবে আমাদের ঘর, আমাদের বাড়ী

সমাধি গুহায় পরিণত হয়েছে। আমরা কখনো ভাবিনি মৃত্যু ভয়ে আমাদেরকে এভাবে দাঁড়াতে হবে। একপ্রকার বলা যায় এই ভয় আমাদের মানসিকভাবে মৃত করে ফেলেছে। যার ফলে আমরা গৃহ সমাধিতে বন্দী হয়ে আছি। কোথাও আলো নেই, অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু আসলেই কি তাই? যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান আমাদেরকে কি সেই বার্তা দেয়? যিশুর পুনরুত্থান আমাদেরকে কি বলছে?

পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। পবিত্র বাইবেলে আমরা যদিও এ বিষয়ে সরাসরি কোন উত্তর পাই না কিন্তু আমাদের জীবনের সব ব্যাখ্যাই বাইবেলে আছে। আমাদের বাস্তব জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতি বা অবস্থায় ঈশ্বর কি চান বাইবেলে সেকথা লেখা আছে। করোনাভাইরাসের মতো মহামারী যুগে যুগে ছিল। তাই এই মহামারীটাকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। একদিকে ইতিবাচক হিসেবে, অন্যদিকে নেতিবাচক হিসেবে। নেতিবাচক হিসেবে দেখলে– মহামারীটা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছ থেকে শাস্তি বা দন্ড। মানুষ পাপ করেছে তাই তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আর ইতিবাচক দিক হলো এর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে আসা। এখানে একটা মঙ্গল চিন্তা কাজ করে। মহামারীর অভিজ্ঞতায় আমরা নতুন কিছু হওয়ার পথ খুঁজে পাই। তাই আমাদের ভালো বা মঙ্গলের জন্যে এগুলো আসে। করোনাভাইরাসের কারণে আমরা পৃথিবীর সব মানুষ এক হতে পেরেছি, সবাই সবাইকে নিয়ে ভাবছি। সবার মধ্যে একটা সংহতি। এই মহামারী থেকে নিজে বাঁচতে হবে এবং অন্যকেও বাঁচাতে হবে। এখান থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে মানুষ মানুষের ভালো চায়, কল্যাণ চায়।

করোনাভাইরাসের মহামারীর কারণে আমরা কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি নি। ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করছি না। বরং আমাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়েছে। এই মহা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সব ধর্মের মানুষ পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের জন্য কতো প্রার্থনা করছে, প্রায়শ্চিত্ত, ত্যাগস্বীকার করা হচ্ছে। আমাদের সবার মধ্যেই একটা সুন্দর অদম্য চিন্তা কাজ করছে যে ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করবেন না, সেটা তিনি করতে পারেন না। আপাততঃ সাময়িক কিছু কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। আমরা কোনভাবেই ভাবতে পারি না যে এই বুঝি সব শেষ। আমরা বিশ্বাস করতে চাই এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানব জাতির জন্য দীর্ঘস্থায়ী ভালো কিছু করতে চান। এখান থেকে ভবিষ্যতের জন্যে একটা আশা সৃষ্টি করে যে এই মহামারী যুদ্ধ খুব তড়াতাড়ি শেষ হবেই। আমরা জয়ী হবই। মুক্তি আমাদের হবেই।

এই যে স্পিরিট, সেই স্পিরিট-টা আমরা

যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা থেকেই পাই। যিশু মার্থা ও মারীয়ার ভাই লাজারকে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। মৃত্যুর অন্ধকার গুহা থেকে তাকে বের করে এনেছিলেন। চারদিন হয়ে যাওয়া মৃত লাজারের সেই সমাধির ভিতর যে পচন ধরেছিলো সেখানে তাকে জীবিত করেছেন। যিশু লাজারকে বলেছেন, লাজার তুমি বেরিয়ে আস। এবং লাজার বেরিয়ে এসেছে। যিশু আরো বলেছেন, ওর সব বাঁধন খুলে দাও। আর ওকে যেতে দাও। যিশু এভাবেই লাজারকে জীবিত করলেন। কারণ তিনি তাকে ভালবাসেন। যিশু আমাদের সকলকেও খুব ভালবাসেন। লাজারকে সমাধিগুহা থেকে যেভাবে বের করে এনেছেন তেমনি আমাদেরকেও করোনাভাইরাসের কারণে বর্তমান গৃহ সমাধি থেকে নিশ্চয়ই বের করে আনবেন। লাজারের লেগেছে ৪ দিন। আমাদের কয়দিন লাগবে! ৪০ দিন! আমরা তা কেউই জানি না। ঈশ্বর সব জানে। আমরা শুধু বিশ্বাস করি ও জানি তিনি আমাদেরকে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত করে নতুন জীবনে নিয়ে আসবেন। আমাদের মধ্যে সকল ভয়ের বাঁধন তিনি অবমুক্ত করবেন। লাজারের মতো আমরাও আবার নতুন জীবন শুরু করব। রূপান্তরিত নতুন মানুষ হব। ভালবাসার টানে তিনি আমাদের পাশে আছেন। এই কঠিন সময়ে আমাদের মনে রাখা জরুরী যে, আমাদের জীবনে যখন দুঃখ-যন্ত্রণা আসে, এর অর্থ হলো আমরা জীবিত আছি। সমস্যা যখন আসে তার অর্থ হচ্ছে আমরা সমাধান করতে পারি, আমরা শক্তিশালী।

অস্বীকার করার উপায় নাই করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। অনেকগুলো মূল্যবান ও সম্ভাবনাময় মানব জীবন আমরা হারালাম। যা কাটিয়ে ওঠা খুব কঠিন। কিন্তু এটাও সত্য যে করোনাভাইরাসের কারণে আমরা বিশেষ কিছু পেয়েছিও। অখণ্ড মানবজাতি হিসেবে আমাদেরকে একত্রে আসার, শিখার ও কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস তাই একটি আশীর্বাদও বটে। এটা মানবতা ফিরিয়ে এনেছে। মানুষকে তার স্রষ্টার কাছে এবং নৈতিকতায় ফিরিয়ে এনেছে। করোনাভাইরাসের কারণে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে এখন আমরা বেশি প্রার্থনা করি। মানুষ এখন বর্তমান প্রযুক্তির চেয়ে ঈশ্বরের উপর বেশি নির্ভরশীল। করোনাভাইরাস এখন আমাদেরকে ঘরে, পরিবারের সাথে অর্থপূর্ণ সময় কাটানোর, সহজ-সরল জীবনযাপন ও অহেতুক প্রতিযোগিতা না করে সহযোগিতার করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমাদের জীবনটা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। করোনা ভাইরাসের কারণে প্রকৃতিও আবার নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রকৃতির প্রতি সত্যিই আমরা অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করেছি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইতালিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাদার ও সিস্টারগণ এরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকে মারাও গেছেন। তবুও তারা আক্রান্ত রোগীদের সেবা থেকে পিছুপা হননি। তাদের বিশ্বাসের জীবনের সাক্ষ্য তারা জীবন দিয়ে রেখেছেন যা চিরদির আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। আমি এখানে বিশেষ করে ইতালির ফাদার জুয্যাপো বিআরদালি নামটা উল্লেখ করব। এই ৭২ বয়সী কাথলিক ধর্মযাজক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা খুলে তিনি অচেনা এক কম বয়সী রোগীকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই রোগী তার পরিচিত কেউ ছিলেন না। নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আরেকজনের জীবন বাঁচাতে ফাদার জুয্যাপোর এই জীবন দান বিশ্বের ইতিহাসে মানবপ্রেমের এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ফাদার জুয্যাপোর মতো এভাবেই এই ভয়াবহ সংকটের সময় মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। যিশুর পুনরুত্থান পর্বে আমরা ঈশ্বরের দয়া ও মহানুভবতা কামনা করি। প্রার্থনা করি তিনি যেন অতি শীঘ্রই আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন। আমরা সবাই মিলে আনন্দ সহকারে যেন এই পুনরুত্থান পর্ব পালন করতে পারি॥ ❑

করোনাভাইরান: অন্য চোখে

(২৫ পৃষ্ঠার পর)

হত্যা করা হয় তার হিসাব কি আমরা রাখি? পাশাপাশি, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে কতো শত প্রাণী যে প্রতিনিয়তই বেঘোরে প্রাণ হারায়, প্রকৃতিও যে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার খবর কি রাখি? সেই সকল অবাক্ শিশু, ভ্রুণ ও পশু-পাখির কান্না এবং প্রকৃতির কান্না কি আমরা শুনতে পাই? ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সাবর্জনীন পত্র 'Laudato Si' এ পোপ ফ্রান্সিস বলেছিলেন, "প্রকৃতি এখন ক্রন্দনরত"। তাই তিনি প্রকৃতির যত্ন নিতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেছিলেন। বাস্তবিক, পৃথিবীতে যুগেযুগে অনেক জিনিয়াস জন্ম নিয়েছেন, যারা মানবজাতির জন্য অনেক আশীর্বাদের পাত্র হয়ে এসেছিলেন। কেউ বিজ্ঞানে, কেউ চিকিৎসায় আবার কেউ বা সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। কাজেই যুগযুগ ধরে কোটি কোটি ভ্রুণহত্যা করে আমরা হয়তো অনাগত কোন জিনিয়াসকেই হত্যা করে ফেলেছি! এ মহা দূর্যোগে তিনি এ পৃথিবীতে থাকলে হয়তো করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে জাদুকরী ঔষধ তৈরি করতে পারতেন! একটি প্রবাদ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, "ঈশ্বর ক্ষমা করেন, কিন্তু প্রকৃতি ক্ষমা করেনা"। কাজেই, বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে আমরা বলতে পারি, প্রকৃতিও এখন গর্ভপাত করছে। যাদের আরও বাঁচার কথা ছিল, তারা আগেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। প্রকৃতিও এখন হয়তো দেখাতে চাইছে, জীবন নাশের ফলে কতটা বেদনা হৃদয়ে উথলে ওঠে!

এক সময় করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয়তো শেষ হয়ে যাবে, হয়তো আরও অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটবে, কিন্তু শেষে যারা থাকবে তারা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, দুষণহীন পৃথিবী ফিরে পাবে। পাশাপাশি, প্রকৃতির প্রতি যে চেতনা মানুষ লাভ করছে, তার ফলে মানুষ প্রকৃতির প্রতি সদয় হবে, ন্যায্য আচরণ করবে এবং আরও সচেতন হয়ে জীবনযাপন করবে। আমাদের যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থান করে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, যুগযুগ ধরে জমে থাকা রাশি রাশি পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। মানুষের জীবনে নতুনত্ব এনেছেন। মানুষ মৃত্যুর পুরনো বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুনত্ব লাভ করেছে। তাই যারাই প্রভু যিশুতে বিশ্বাস রেখে জীবন যাপন করবেন, তারাই পাবেন অনন্ত জীবন, পাপের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত জীবন হয়ে উঠবে মুক্ত ও নতুন ধারার জীবন। প্রকৃতির মতোই মানুষও নতুনধারায় ফিরে এসে সৃষ্টি ও কৃষ্টির প্রতি সহমর্মী হবে, বিশ্বাসে-নিঃশ্বাসে নতুন পথের যাত্রী হবে॥ ❑

করোনাভাইরাস: অন্য চোখে

ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কেননা, এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে এরই মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা যেএকত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে! বিভিন্ন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রবলছে, এই সংখ্যা হয়তো শীঘ্রই এক লাখ ছাড়িয়ে যাবে। তাই এই মহামারী ঠেকাতে দেশে দেশে চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। যেমন, বিশ্বের সিংহভাগ দেশ এখন কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করছে, যেন এই মরণ ভাইরাস গণহারে ছড়াতে না পারে। এই ব্যবস্থার ফলে মানুষ এখন ঘরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য, গুরুতর ও অতি প্রয়োজনীয় কোনকিছুর প্রয়োজন ছাড়া মানুষ এখন আর বাইরে যেতে পারছেনা। কল-কারখানা, অফিস-আদালতের পাশাপাশি অনেক দেশে গির্জা, মন্দির, মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে যেন মানুষে ঘরে বসেই প্রার্থনা করে। এতে করে কেউ বাইরে যেতে পারছেনা, ঘোরাঘুরি করতে পারছেনা, ঘরের বাইরে জগিং করতে পারছেনা, খেলাধূলা করতে পারছে না প্রভৃতি। মোদ্দাকথা, বিধি-নিষেধ এবং নানা প্রেষণার মাধ্যমে মানুষকে মূলত ঘরকুনো করে রাখা হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে 'সামাজিক দূরত্ব'। অর্থাৎ মানুষ যেন একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকে এবং দূরত্ব বজায় রেখেও চলে। ফলে কার্যত মানুষ এখন গৃহবন্দী এবং একঘরে বা বাধ্যগত ঘরকুনে।

এই দূর্বিষহ অবস্থা কারও কাম্য ছিলনা, আর এটি তাই কারও ভাললাগার কথাও নয়; ভাইরাসে মৃত্যুর ভয় তো আছেই! তবুও এ অবস্থার মধ্যেও বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আমরা খুঁজে পাই। আপাতদৃষ্টিতে, কথাটি শ্লেষ মেশানো মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এই প্রাদুর্ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সুন্দর কিছু বিষয় প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে।

এই প্রাদুর্ভাবে ধর্ম-বর্ণ, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছে, প্রার্থনায় মনোনিবেশ করছে। পশ্চিমা দেশগুলোর গির্জায় কিছুদিন পূর্বেও শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া অন্যদের চোখে পড়েনি, ধর্ম-কর্মে নিদারুণ শিথীলতা ছিল কিন্তু বর্তমানে সব বয়সের মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে। তারা ঘরে বসে পরিবারের সাথে একত্রে প্রার্থনা করছে। ধর্ম-কর্মে যেন নবজাগরণ এসেছে! মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর বিশ্বাস যেন ফিরে এসেছে। কেউ কেউ বলেন যে, তারা মরলে মসজিদেই মরবেন, কিন্তু তবুও এই দুঃসময়ে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ কৃপা চাইতে পিছুপা হবেননা (সূত্র:বিবিসি বাংলা)। পাশাপাশি, পরিবারের সদস্যরা এখন একে-অন্যকে সময় দিচ্ছে, একসাথে বাস করছেন। অথচ ব্যস্ততার জগতে মানুষ এতোই ব্যস্ত যে, কারও জন্য কারও সময় নেই! সবাই ছুটে আর ছুটে!

এ সময়ে মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার ধারণা ও মনোভাব জোরদার হয়েছে। এখন মানুষ এতোই সচেতন হয়েছে যে, কোথায় কোথায় ও কিভাবে আমরা বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হতে পারি সে বিষয়ে সকলে খুবই সতর্ক। পাশাপাশি, নিজেদের ঘর-দোর, বাড়ীর আশপাশ, রাস্তাঘাট, পাড়া-মহল্লা, এলাকা এবং নিজের দেশ কিভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে ব্যাপারে মানুষের মধ্যে একটা গভীর চেতনা এসেছে।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। থেমে গেছে শব্দ দূষণকারী যানবাহন, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান; থেমে গেছে পৃথিবীর বুক চিরে ছুটে চলা কোটি কোটি গাড়ী; থেমে গেছে পৃথিবীর মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে বায়ুস্তর ফুঁড়ে চলা হাজার হাজার বিমান। সম্প্রতি বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের কারণে কলকারখানা এবং যানবাহন কম চলায় চীনে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড হ্রাস পেয়েছে। ফলে চীনের বায়ু এখন আগের চেয়ে অনেক বিশুদ্ধ। এছাড়াও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, পুরো বিশ্বের বায়ু আগের চেয়ে বিশুদ্ধ হয়েছে। করোনায় বিপর্যস্ত চীন এবং ইতালিতে বায়ু দূষণ পুরোপুরি থেমে গেছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, করোনাভাইরাসে বায়ু দূষণ কমে যাওয়ায় মানুষের মৃত্যু ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। একইভাবে গোটা বিশ্বেই এখন দুষণের মাত্রা অভাবনীয়ভাবে কমে গেছে। বাংলাদেশের গার্মেন্টস্ ও চামড়া শিল্পের কারণে নদীর পানি যে পরিমাণ দুষিত হতো, তাও অনেক কমে গেছে। প্রকৃতির এমন বিশুদ্ধতায় আনন্দিত বন্যপ্রাণীরাও। সম্প্রতি কক্সবাজারের একটি ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছে যেখানে সমুদ্র সৈকতে ডলফিনের বিচরণ দেখা গেছে। লোকজন না থাকায় ভারতেও একটি বন্য গন্ধগোকুলকে মানুষের মত করে রাস্তা পার হতে দেখা গেছে। বন্যপ্রাণীদের এমন আচরণ বলে দিচ্ছে করোনাভাইরাস মানুষের শত্রু হলেও তাদের বন্ধু হয়েই এই পৃথিবীতে এসেছে (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ মার্চ, ২০২০)। অর্থাৎ প্রকৃতি ধীরে ধীরে নিরাময় লাভ করছে।

একটি কালজয়ী গান আমরা গেয়ে থাকি, "মানুষ মানুষের জন্য...।" এ দুঃসময়ে সেটি অনেক বেশি পরিলক্ষীত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, গার্মেন্টস কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের সদস্যগণ রাত জেগে মাস্ক, করোনাভাইরাস প্রতিরোধক পোশাকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রহী তৈরি করছেন। অনেক মানুষ নিজেদের উদ্যোগে পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন, পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালাচ্ছেন, বিনামূল্যে মাস্ক বিরতরণ করছেন প্রভৃতি। আবার যারা চিকিৎসা বা সেবা দিচ্ছেন তারাও বিরতীহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। একটি পত্রিকায় দেখলাম, একজন ডাক্তার বিরামহীনভাবে সেবা দিতে দিতে এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে, তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি। সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া রোগীর বিছানাতেই গা এলিয়ে দিয়ে শিশুর মতো বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। অন্যদিকে, কতো ডাক্তার, নার্স সেবা দিতে দিতে নিজেরাও আক্রান্ত হয়েছেন। এদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই এদেরকে বীরের মর্যাদা দেওয়াই যায়! কাজেই করোনাভাইরাস মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা ও দায়িত্বরোধও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে বটে, কিন্তু নীরবে ও সবার অগোচরে কতো অনাগত শিশু ও ভ্রুণ যে

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

করোনাভাইরাসের ক্ষয়, মানবতার জয়

জাসিন্তা আরেং

বর্তমানে কভিড-১৯ বা নভেল করোনাভাইরাস একটি জাতীয় ও বৈশ্বিক দুর্যোগের নাম। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইতোমধ্যে হাজারো মানুষ মারা গিয়েছে এবং লাখো মানুষ মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্ব মানবতা আতঙ্কের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করলেও ইতিবাচকভাবে বিষয়টি দেখা ও বিবেচনা করা মানুষের চিরাচরিত স্বভাব। বিশ্বে করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলক বেশি হলেও এর ইতিবাচক দিকগুলো মানুষকে নতুন করে ভাবিত করছে, কিভাবে তা মোকাবেলা করা যায়। কেননা দলীয় এবং বৈশ্বিক একতাবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নই করোনার ক্ষয় করতে পারে এবং মানবতার জয়কে করতে পারে গৌরবান্বিত। করোনাভাইরাস নামক এই বৈশ্বিক আতঙ্ক বিরাজ করছে দেশবাসীর মধ্যেও। যদিও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে; তাই আশাহত ও আতঙ্কিত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে করোনাভাইরাসের মোকাবেলা করে মানবতার জয় নিশ্চিত করতে হবে। এই দুঃসময়ে মানুষের সেবায় বিভিন্ন স্থানে মানবতার খাতিরে অনেক জনদরদী মানুষই নিজ-নিজ সামর্থ অনুযায়ী অবদান রেখে চলেছেন নিঃস্বার্থভাবে। যা করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে মানবেতর জীবন-যাপন করা মানুষগুলোকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করছে। এছাড়াও করোনা আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত হাজারো নার্স, ডাক্তার, স্বাস্থকর্মী এবং সংশ্লিষ্টরা নিজের জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এসব কিছুই মানবতাকে মহিমন্বিত করছে। অন্যদিকে দরিদ্র, অভাবী ও দিনমজুরদের জীবনযাত্রা থমকে যাওয়ায় হাজারো মানুষ দিন কাটাচ্ছে অনাহারে। পেটের দায়ে নিম্ন আয়ের মানুষেরা হোম কোয়ারেন্টাইন বিধি মেনে ঘরে থাকতে পারছে না। অসহায় মানুষের কল্যাণার্থে একক কোন পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়, কাজেই সংঘবদ্ধ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বিশ্বব্যাপী এই সংকট মোকাবেলা করা সরকারী তহবিল ও ত্রাণ ও দুর্যোগ তহবিলের সীমিত ফাণ্ড যথেষ্ট নয়। আক্রান্ত রোগিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবাদান নিশ্চিত করতে এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের সহায়তার জন্য আর্থিক অনুদানের বিকল্প নেই। তাছাড়া দেশের লাখো কর্মক্ষম মানুষ অফিস-আদালত, কলকারখানা বন্ধ থাকায় বেকার হয়ে পড়েছে। অনেকেই তাদের বেতন না পাওয়ায় আরো বিপাকে পড়েছে। সংসার চালাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় অবস্থা আরো খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষের দুর্দশা কমাতে অনেক সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এগিয়ে এসেছে। যেমন: বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে জরুরী ভিত্তিতে ৮৫০ কোটি টাকা, এশিয়ার ডেপেলপমেন্ট ব্যাংক চিকিৎসা সামগ্রী কেনার জন্য বাংলাদেশকে তিন লাখ ডলার জরুরী অনুদান দিয়েছে এই করোনা দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য। এছাড়াও দরিদ্রদের দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান করতে বিভিন্ন সংগঠনসহ ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যেমন-বাংলাদেশের সিনেমা জগতের তারকা, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সঙ্গীতশিল্পী, ক্রিকেটার, ফুটবলার এবং বিশিষ্টজনের অনেকেই নিজ-নিজ অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা দান করেছেন এবং কেউ-কেউ কিছু সংখ্যক দরিদ্র মানুষের খাবারের দায়িত্বও নিয়েছেন। বসুন্ধরা গ্রুপ বাংলাদেশ ট্রাফিক পুলিশকে ২৫,০০০ মাস্ক দিয়ে সহায়তা করেছেন। অন্যদিকে ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। পথে-ঘাটে শত-শত পথশিশু ও ছিন্নমূল মানুষ অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। কমলাপুরে মানবেতর জীবন-যাপন করা ছিন্নমূল মানুষ ও পথশিশুদের খাদ্যসামগ্রী দান করে মানবতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাসী, ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থানীয় কর্মহীন দিনমজুর ও গরিব-হতদরিদ্র মানুষদের খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ করেছেন। শহর এলাকায় স্বল্প আয়ের বেশিরভাগ লোকেরাই বেতনের সিংহভাগ বাড়িভাড়া দিয়ে থাকেন। এই দুর্যোগকালীন সময়ে কেউ কেউ বাড়ির ভাড়া মওকুফ করে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়াও এমন মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা অগণিত যারা তাদের পরিশ্রমের কোটি-কোটি টাকা দুঃস্থ-অসহায় ও অভাবে দিন যাপন রত মানুষের জন্য দান করেছেন। জানা-অজানা কত মানুষ যে এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ মোকাবেলায় পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তার হিসেব নেই। এতে সহজেই অনুমেয় যে, করোনাভাইরাস মানুষকে ঘরবন্দী বা ভীতসন্ত্রস্ত এবং নিরাশ করলেও, মানুষের

অন্তরের মানবতাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। আজও মানবতার জয়জয়কার শোনা যায়।

ব্যস্ততম রুটিনের ভিড়ে মানুষ আজ হারিয়ে গেলেও জাতীয় দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে কম-বেশি সকলেই। আধুনিক সমাজের বলয়ে মানুষ এতটাই স্বার্থান্বেষী চিন্তায় মগ্ন যে নিজেকে ছেড়ে অন্যের কথা চিন্তা বা অপরকে সহায়তা করার মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম হলেও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলে লক্ষ্যণীয় যে আজ মানুষ মানুষের কথা ভাবে। করোনাভাইরাস মানুষকে আতঙ্কিত ও আশাহত করলেও মানুষ আজ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে মানুষ মানুষের জন্যে আর জীবন জীবনের জন্যে। তাই তো আজ বিশ্বের সকল ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন এগিয়ে এসে নিজেদের মোমবাতির ন্যায় জ্বালিয়ে অন্যদের আলো দিয়ে আলোকিত করছে মানবতাকে।

করোনাভাইরাসের মত ছোট দানবের কাছে বিশ্ববাসী অসহায়। পরিস্থিতি এতটাই ভীতিকর যে ক্ষমতাশীল ও সম্পদশালী ব্যক্তিরাও অসহায় হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র দেশ নয়, গোটা বিশ্ব যে ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে মানব সভ্যতাকে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। দেশের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষই করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে বাঁচার লড়াইয়ে শামিল হয়েছে, আজ তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে বন্দী। কিন্তু মনোবল হারিয়ে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া অবধি অবিরাম লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীরা মরিয়া হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আজ নয়তো কাল এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার হবেই এবং মানুষ এই ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে।

আদিমকাল থেকেই মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাকৃতিক, মহামারী ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে বাঁচতে লড়াই করেছে, প্রয়োজনে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। বর্তমানে এই ক্রান্তিকালে মানুষকে আদিম মনোবল ও স্পৃহাকে পুনরায় জাগ্রত করতে হবে। কেননা করোনাভাইরাসের সাথে লড়াই, আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। এ লড়াইয়ে মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নিজেকে বাঁচতে হবে এবং অন্যকেও বাঁচতে সহায়তা করতে হবে। করোনাভাইরাসের মত দানবের কাছে নতি স্বীকার করার মানুষ এই বাঙালি নয়। আমরা বাঙালিরা যেন এই অদৃশ্য দানবের কাছে নিষ্ক্রিয় হয়ে না পড়ি। কাজেই ভাইরাসের কাছে হার মানলে চলবে না, বরং সাহস নিয়ে ভয় ও আতঙ্ককে জয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হাজারো মানুষ এই করোনাভাইরাসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তা চলমান রয়েছে। কিন্তু তাই বলে মৃত্যুর এই তাণ্ডবলীলা মানব সভ্যতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। প্রসঙ্গক্রমে বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও সাহিত্যিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন, "মানব সভ্যতার জন্য এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট। পরিস্থিতি এখনো ভীতিকর; কিন্তু এই ভয় ও আতঙ্ককে পরাজিত করাই হবে মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র মূলমন্ত্র। কিছু মানুষের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যু হবেই; কিন্তু মানবতার মৃত্যু নেই। মানব সভ্যতার ধ্বংস নেই।" তাই আসুন মানবতার ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ধারণ করে করোনার সৃষ্ট ক্ষয়কে রোধ করতে ব্রতী হই। কেননা মানবতার জয়ই পারে, করোনার ক্ষয়কে নিশ্চিত করতে॥ ❑

তথ্যসূত্র:

দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সমকাল, দৈনিক যুগান্তর, দি দেইলি অবজারভার।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে

সৌমিক মোল্লা

এসো হে নববর্ষ নব সাজে এসো
নব প্রেরণার বাণী নিয়ে,
এসো তুমি এসো হৃদয় মাঝে
নব জীবনের স্বপ্ন নিয়ে।
যাক দূরে যাক হিংসা-বিবাদ
নব হোক সকল মানব প্রাণ।
শুচি শুদ্ধ হোক মন, ঝরুক আর্শিবাদ
প্রাণে প্রাণে বাজুক ভালবাসার গান।
স্বাগত হে নববর্ষ স্বাগত তোমায়
একটি বছর পরে মানবের তরে
সুখ, শান্তি আর ভালবাসার স্বপ্ন নিয়ে
নববর্ষ আবার এসেছো বাংলার ঘরে ঘরে।

সচেতন মনোবল

স্বপন ষ্টিফেন রোজারিও

বিশ্ব শ্রষ্ঠা আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন মানব জাতি
দিয়েছেন বিদ্যা, দিয়েছেন বুদ্ধি, দিয়েছেন চলার গতি।
মানুষ জয় করেছে বিশ্ব পরিমন্ডল চলেছে শূন্য উড়ে,
ঘুরেছে মানুষ পৃথিবী এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত জুড়ে।
প্রাণীকুলে শ্রেষ্ঠ আসন কেরে নিয়েছে মানব জাতি,
ভয় নেই তোমাদের ঈশ্বর দিচ্ছেন আপন জ্যোতি।
ছোট্ট, ক্ষুদ্র, করোনা তুমি সারা বিশ্বে বিস্তার চাও ?
মানুষের ক্ষতি করে কি-বা সুখ তুমি পাও।
মানব জাতিকে বিদায় করে ধরণীতে থাকবে একা
মিথ্য তোমার আস্ফালন, সময়ের দাবিতে তুমি হবে ফাঁকা।
চিন্তার খোরাক, অস্বস্তী দিয়েছ মানুষের মনে,
এক নিমিশে বিদায় হবে কখন সংগোপনে।
জাগো মানব,সচেতন হও রাখ মনে বল,
অবশ্যই জয় করিবে, করোনা যাবে রসাতলে।
বিশ্ব স্বস্থ্য সংস্থা দিয়ে যাচ্ছে মানব রক্ষার বাণী,
অবজ্ঞা না করে প্রত্যেকে যেন তা মানি।
কোরানে বলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঈমানের অঙ্গ,
সাবান পানিতে হাত ধোয়ার আইন, না করি ভঙ্গ।
ওহে মানব, একযুগে কাজ করে যাও, করবে নাকো হেলা,
সচেতন আর মনেবলে ভাসবে জয়ের ভেলা।

“সবুজ ধানের শিষের মত প্রাণ যে এলো ফিরে আবার”

পুনরুত্থানের একটি নতুন গান

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান সকল খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। এই পবিত্র মহোৎসবটি প্রতিবছরেই আমাদের অন্তরে নিয়ে আসে জীবনকে দেখার ও বোঝার নতুন কিছু অনুভূতি।

চল্লিশদিন ব্যাপি তপস্যা কালের প্রার্থনা, উপবাস আর ধ্যানের পরে আসে পুণ্য শুক্রবার (Good Friday) - প্রভু যিশুর মর্মান্তিক ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর স্মরণানুষ্ঠান। পুণ্য শুক্রবারের সেই দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, নিরাশা ও অন্ধকারকে ভেদ করে রবিবারে আসে পুনরুত্থান! আমরা পাই নব আলো -‘খ্রিস্টের জ্যোতি’ (The Radiance of Christ)।

সেই উজ্জ্বল আলোয় জীবন ভরে ওঠে এক নতুন আশায়। জীবনের সকল দুঃখ, কষ্ট, রোগ-ব্যধি, দুর্বলতার মাঝে আমরা পাই নতুন জীবনের আশ্বাস, যেমনটি আছে পুনরুত্থানের এই গানটিতে:

“জীবনে আর এক জীবন আছে
সে তো শুধু ওই জ্বালাময় মৃত্যু নয়।”
(কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি’,
(গীতাবলী গীত নং ১০২৫)

কারণ, প্রভু যিশুর পুনরুত্থানে আমরা পেয়েছি নতুন প্রাণ।

কয়েক বছর পূর্বে ভ্যাঙ্কুভার, কানাডায়, আমার সৌভাগ্য হয় ইংরেজী ভাষায় উদ্‌যাপিত পুণ্য শনিবার রাতের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে (Easter Vigil) এর গানের দলে একটি নতুন গান গাওয়ার। বছরটি ছিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, এবং গানটি ছিল

“Love is Come Again” by J.M.C. Crum (1872-1958) |

গানটির প্রথম কলি এরূপ :

“Now the green blade riseth
from the buried grain
Wheat that in dark earth many
days has lain;
Love lives again, that with the
dead has been;
Love is come again, like wheat
that springeth green.”

(From Catholic Book of Worship II, Pew Edition, Canadian Conference of Catholic Bishops and Gordon V. Thomson Ltd, Ottawa, 1980, p.502).

রচয়িতার জন্ম ও মৃত্যুর বছরগুলো খেয়াল করলে বোঝা যায় গানটি কত পুরানো। তবু গানটির কথা ও সুর আমাকে এমন আকর্ষিত করে যে তখনই গানটির অনুপ্রেরণায় আমার মনে একটি নতুন বাংলা গান রূপ নিতে থাকে। অবশ্য বাংলার প্রেক্ষাপটে, বাংলার সুরে।

সেই গানটির খসড়া এতদিন আমার খাতায়ই পড়েছিল। বর্তমান কালের, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাসের এই প্রকোপের (Pandemic-এর) দিনগুলোর প্রেক্ষাপটে পুণ্যসপ্তাহ ও পুনরুত্থান উৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে ধ্যান ও চিন্তার মাঝে, আমার সেই গানের কথা মনে পড়ে যায়। সেই গানটিকেই এখন চূড়ান্ত করে, স্বরলিপি সহ এখানে প্রকাশ করা হল॥ ❑

সবুজ ধানের শিষের মত

সবুজ ধানের শিষের মত
প্রাণ যে এলো ফিরে আবার
যে বীজ ছিল মাটির নীচে
অঙ্কুরে তা রূপের বাহার।

১। তেমনি যিশু এলেন দেখ
মুক্ত করে কবর দুয়ার
মৃত্যুকে জয় করে তিনি
মুক্তিদাতা হলেন সবার।

২। পুনরুত্থিত প্রভু আসেন
প্রতিদিন মোদের প্রাণে
ক্লান্ত-মৃত হৃদয় তিনি
নতুন করেন প্রেম দানে॥

সবুজ ধানের শিষের মত

কথা, সুর ও স্বরলিপি :
ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

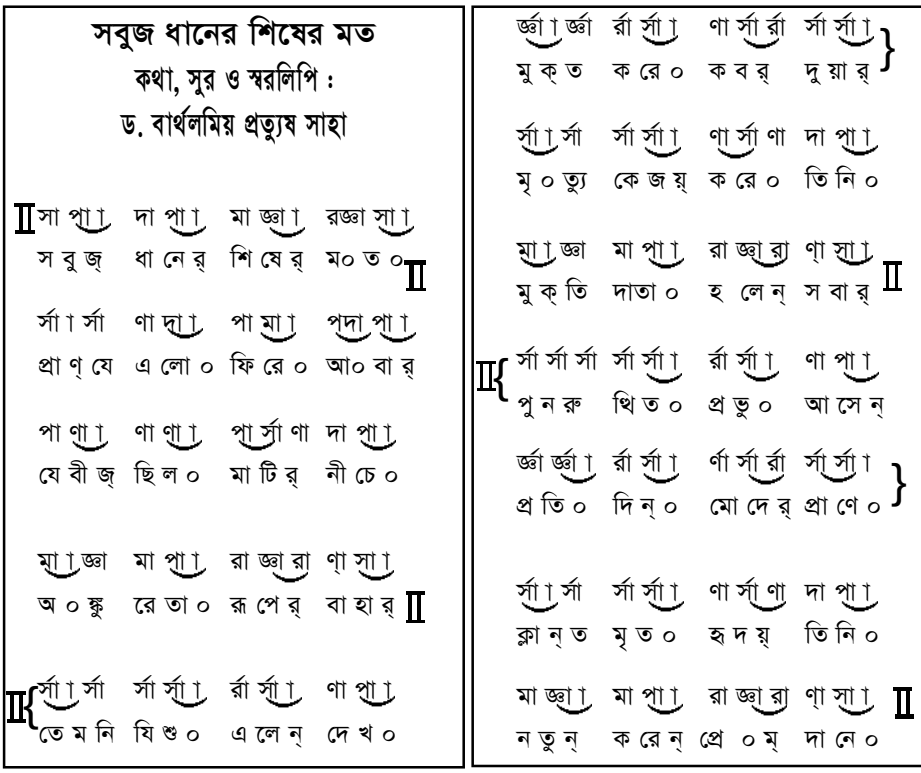

পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন - সত্য, আনন্দ, রহস্য ও বিস্ময়ে ভরা

(ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজে-এর এ ভেকেসেন উইত দা লর্ড গ্রন্থ অবলম্বনে)

ফাদার জেরী গমেজ, এসজে

২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আট-দিন-ব্যাপী বাৎসরিক নির্জন ধ্যান করার সুযোগ পাই। তখন প্রভু যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে ধ্যান করে অনেক আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা পাই। ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজে- এর এ ভেকেসেন উইত দা লর্ড গ্রন্থের কাঠামো অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে ধ্যান করতে হয় নির্জন ধ্যানের প্রায় শেষের দিকে। সেই অনুপ্রেরণার আলোকে আমি এই প্রবন্ধটি লিখেছি।

অবিশ্বাস্যকর এক বিশ্বাস: সাধু লুক রচিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে, পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্ট যখন এগারো জন শিষ্যকে দেখা দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা চমকে গেলেন, ভয়ে বিভ্রান্ত হলেন। তাঁদের মনে হল, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন। আনন্দের আতিশয্যে তখনও তাঁদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত ছিলেন *(লুক ২৪:৩৬-৪১)*। আর সাধু যোহন রচিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে, পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্ট যখন এগারো জন শিষ্যকে দেখা দিয়েছিলেন, তখন শিষ্যদের কেউই তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করলেন না যে, 'আপনি কে?' কারণ তাঁদের আর তখন জানতে বাকি ছিল না যে, তিনি প্রভু *(যোহন ২১:১২)*।

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজে, তার এ ভেকেসেন উইত দা লর্ড গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে (যার নাম 'ভয় পেয়ো না') বলেছেন, যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা যেন অবিশ্বাস্যকর এক বিশ্বাস। এই অবিশ্বাস্যকর ঘটনা আনন্দে ভরা। এই অবিশ্বাস্যকর ঘটনা একইসাথে রহস্য ও বিস্ময়ে ভরা। এই অবিশ্বাস্যকর বিশ্বাস এক গভীর বিশ্বাস, যা সত্য, আনন্দ, রহস্য ও বিস্ময়ে ভরা। গভীর ধ্যান এই সত্য প্রকাশ করে যে, যিশু খ্রিস্টই প্রভু।

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন, এসজের মতে, চারটি মঙ্গলসমাচারই প্রভু যিশুর পুনরুত্থান কাহিনী বর্ণনা করেছে। চারটি মঙ্গলসমাচার দাবি করে যে, পুরুত্থিত যিশুর দর্শন পেয়েছেন বিভিন্ন জন। দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাগুলো চারটি মঙ্গলসমাচারের রচয়িতাগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। রচয়িতাগনের উপস্থাপনায়, দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্যে, ও দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে অন্যদের সাক্ষ্যে আছে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। সাক্ষ্যদানে বৈচিত্র্য থাকলেও সব দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাঁরা প্রভুকে দেখেছেন। এ এমন এক ধরণের সত্য যা মানুষ সৃষ্ট ভাষা বর্ণনা করতে পারে না। কেউ কেউ প্রভুকে দেখেছেন কিন্তু সবায় দেখছেন না। ভাষাটা ধর্মীয়। সত্যটাও ধর্মীয়। আনন্দে তাঁরা বেহিসাবি। বর্ণনায়ও তাঁরা বেহিসাবি। অন্যদের অভিজ্ঞতা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। কারণ, নিজের অভিজ্ঞতা নিজে বলা আর নিজের অভিজ্ঞতা অন্যের মুখে শুনা এক কথা নয়। কথার মধ্য দিয়ে সব বলে কয়ে বর্ণনা করা যাচ্ছে না। দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দেখছেন একইসাথে ঐতিহাসিক যিশু ও বিশ্বাসভিত্তিক খ্রিস্টকে। ঐতিহাসিক যিশুকে দেখার জন্য চাই বিশ্বাসের চোখ। আবার ঐতিহাসিক যিশুকে প্রত্যক্ষ না করেও বিশ্বাসের চোখ দিয়ে তা অভিজ্ঞতা করা যায়। সাধু পল ঐতিহাসিক যিশুকে দেখেন নি, কিন্তু পুনরুত্থিত যিশু তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন খ্রিস্টে বিশ্বাসী। বিশ্বাসের চোখ দিয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করলে, পুনরুত্থিত যিশু কাকে প্রথম দেখা দিলেন, পুনরুত্থিত যিশু প্রথমে কোন স্থানে দেখা দিলেন, পুনরুত্থিত যিশু যেখানে শিষ্যদের দেখা দিলেন সেখানে কতজন শিষ্য উপস্থিত ছিলেন, ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের বিব্রত করবে না।

চারটি মঙ্গলসমাচার অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে ধ্যান : ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজের মতে,

১) চারটি মঙ্গলসমাচারের কেন্দ্রীয় বৃত্তে আছে যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী।

২) দ্বিতীয় বৃত্তে আছে যিশুর কর্ম ও প্রচার জীবন।

৩) তৃতীয় বৃত্তে আছে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান কাহিনী।

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজে'র মতে, চারটি মঙ্গলসমাচার অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান

সাধু মার্ক অধ্যায় ১৬ : অন্য তিনটি মঙ্গলসমাচার অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান ঘটনার সারাংশ পাওয়া যায় এই মঙ্গলসমাচারে। প্রথমে প্রভু যিশু মাগদালার মারীয়াকে দেখা দেন। শিষ্যরা মাগদালার সাক্ষ্য বিশ্বাস করেননি। তারপর এম্মাউসের পথে প্রভু যিশু দুই শিষ্যকে দেখা দেন। এরপর প্রভু যিশু শিষ্যদের ভোজের সময় দেখা দেন। এই মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধু মথি অধ্যায় ২৮ : জেরুসালেমে দুই মারীয়াকে দেখা দেন। তারপর একই দিনে সন্ধ্যা বেলা গালিলেয়াতে এগারো জন শিষ্যকে দেখা দেন। পুনরুত্থানের পর প্রভু যিশু কিছু দিন তাঁদের সাথে রইলেন।

সাধু লুক অধ্যায় ২৪ : প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে নারীদের সাক্ষ্য শিষ্যরা বিশ্বাস করেননি। এম্মাউসের পথে প্রভু যিশু দুই শিষ্যকে দেখা দেন। তারপর একই দিনে জেরুসালেমে এগারো জন শিষ্যকে তিনি দেখা দেন। প্রভুকে প্রথমে শিষ্যরা চিনতে পারছিলেন না (যেমন,এম্মাউসের পথে দুই শিষ্য, এগারো জন শিষ্য, ইত্যাদি)। একই দিনে রাতের বেলায় প্রভু যিশু স্বর্গারোহণ করেন।

সাধু যোহন অধ্যায় ২০-২১: মাগদালার মারীয়াকে প্রভু যিশু দেখা দেন। তারপর জেরুসালেমে দশ জন শিষ্যকে প্রভু যিশু দেখা দেন। টমাস শিষ্যদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করেননি। আট দিন পর টমাসকে প্রভু যিশু দেখা দেন। তারপর গালিলেয়াতে এগারো জন শিষ্যকে প্রভু যিশু দেখা দেন। কিছু দিন প্রভু যিশু তাঁদের সাথে রইলেন। প্রভু যিশুকে প্রথমে তাঁর সঙ্গীরা চিনতে পারছিলেন না (যেমন, মাগদালার মারীয়া,

টমাস, দশ জন শিষ্য, ইত্যাদি।)। আরেকটা ঘটনার সময় এগারো জন শিষ্য প্রভুকে চিনতে পারেন। প্রভুকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলেন না তাঁরা। কারণ তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তিনিই প্রভু। প্রভু যিশু মাগদালার মারীয়াকে বললেন, তাঁকে আর আঁকড়ে ধরতে হবে না। কারণ তাঁকে আর হারাবার ভয় নেই। তিনি আছেন, সব জায়গায় এবং সব সময়ের জন্য। প্রভু যিশু একই সাথে একই ব্যক্তি আবার একই ব্যক্তি নন, একইসাথে ঐতিহাসিক যিশু ও বিশ্বাসভিত্তিক খ্রিস্ট।

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজে'র মতে, চারটি মঙ্গলসমাচার অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনাগুলোর অবলম্বনে ধ্যান করা যায়। যদি কেউ মার্ক রচিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা উপর ধ্যান করেন, তিনি যেন করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের ১ম পত্রের, অধ্যায় ১৫, ১ থেকে ২৮ পদ পর্যন্ত সাথে নিয়ে ধ্যান করেন। যদিও সাধু পল ঐতিহাসিক যিশুকে দেখেন নি, কিন্তু পুনরুত্থিত যিশু তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন।

সাধু পল বলেনঃ **১৫:১** ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তাঁরই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। **১৫:২** আমি তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার যেরূপে প্রচার করেছি, সেই রূপে তা যদি আঁকড়ে ধরে থাক, তবে তা দ্বারা তোমরা পরিত্রাণও পাচ্ছ, অন্যথা, তোমরা বৃথাই বিশ্বাসী হয়েছ! **১৫:৩** তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, **১৫:৪** তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; **১৫:৫** এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; **১৫:৬** পরে তিনি একই সময়ে পাঁচশ'র বেশি ভাইকেও দেখা দিলেন: এদের অধিকাংশ এখনও আছে, কেউ কেউ কিন্তু এর মধ্যে নিদ্রাগত হয়েছে; **১৫:৭** তারপর তিনি যাকোবকে এবং পরে সকল প্রেরিতদূতকে দেখা দিলেন। **১৫:৮** সবার শেষে তিনি আমাকেও যেন এক অকালজাতককেই দেখা দিলেন। **১৫:৯** সত্যিই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি। **১৫:১০** কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি আসলে আমি নই, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে। **১৫:১১** যাই হোক, আমিই হই বা তাঁরাই হোন, আমরা এভাবেই প্রচার করেছি আর তোমরা এভাবেই বিশ্বাস করেছ। **১৫:১২** সুতরাং, খ্রিস্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? **১৫:১৩** মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিস্টও তো পুনরুত্থিত হননি। **১৫:১৪** আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। **১৫:১৫** আবার, আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রিস্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। **১৫:১৬** কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রিস্টও পুনরুত্থিত হননি। **১৫:১৭** আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। ১৫:১৮ আর যারা খ্রিস্টে নিদ্রা গেছে, তারাও একেবারে বিলুপ্ত। **১৫:১৯** আমরা যদি কেবল এ জীবনেই খ্রিস্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা। **১৫:২০** আসলে খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন নিদ্রাগতদের প্রথম ফসল রূপে। **১৫:২১** কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান ১৫:২২ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিস্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে; ১৫:২৩ অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রিস্ট, প্রথম ফসল যিনি, তারপর, খ্রিস্টের পুনরাগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। **১৫:২৪** এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। **১৫:২৫** কেননা যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। **১৫:২৬** সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, **১৫:২৭** কারণ তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে। কিন্তু যখন শাস্ত্র বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। **১৫:২৮** আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু, সবারই মধ্যে।

পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্টের অমৃতময় কথাগুলো আনে অনেক আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা:

প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের অনেকভাবে অনুপ্রাণিত করে। চারটি মঙ্গলসমাচারের উল্লেখিত পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্টের অমৃতময় কথাগুলো আমরা নিজেদের মত প্রাসঙ্গিক করে নিতে পারি। পুনরুত্থিত প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদেরও বলেনঃ আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি যুগান্ত পর্যন্ত।---তুমি কি আমাকে ভালবাস?---তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?--- আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।---আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।--- অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।--- তোমাদের শান্তি হোক!--- কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?--- আমাকে আঁকড়ে ধরো না ---চলতে চলতে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?--- নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর!---এ কি অবধারিত ছিল না যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রিস্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?--- তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে? --- আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি---

মঙ্গল হোক!---ভয় পেয়ো না---স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে।--- তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশ্যে তাদের দীক্ষাস্নাত কর।--- তিনি আবারও ফুঁ দেন ও বলেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর।'

শিষ্যচরিত গ্রন্থ অনুসারে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা নিয়ে ধ্যান:

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজের মতে, শিষ্যচরিত গ্রন্থে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা

অধ্যায় ১ : সাধু লুকের প্রথম গ্রন্থে (লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে) পুনরুত্থানের দিনেই প্রভু যিশু স্বর্গারোহণ করেন। লুকের দ্বিতীয় গ্রন্থ (শিষ্যচরিত) অনুসারে, পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর প্রভু যিশু স্বর্গারোহণ করেন। পুনরুত্থানের দিনেই প্রভু যিশু পিতার কাছে ফিরে যান। বলা যায়, শিষ্যচরিত গ্রন্থে প্রভু যিশুর যে স্বর্গারোহণের কথা বলা হচ্ছে তা প্রভু যিশুর দ্বিতীয় স্বর্গারোহণ। আর তাঁর স্বর্গারোহণের আগে প্রভু যিশু পবিত্র আত্মার কাছে তাঁর মিশনের দায়িত্ব ভার দিয়ে যান।

অধ্যায় ২ : পবিত্র আত্মাকে লাভ করে ভীত ও লুকিয়ে থাকা শিষ্যরা সাহসের সাথে সুসমাচারের সাক্ষী হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সাধু পিতর যিশুর জীবদ্দশায় ভয় পেয়ে তিন তিন বার যিশুকে অস্বীকার করেছিলেন। *(মার্ক ১৪:৬৬-৭২)* কিন্তু পবিত্র আত্মাকে লাভ করে এই বার, পিতর ধর্মীয় নেতাদের ভয় পেলেন না বরং সাহসী হয়েছিলেন। কেন? পবিত্র আত্মার সাহায্যের পাশাপাশি পিতরের এই আস্থাও ছিল, যিশু জীবিত আছেন।

অধ্যায় ৩ : সাধু পিতর নাসারেথের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে একজন ব্যক্তিকে সুস্থ করেন। সাধু পিতরের কাছে কোন সোনা দানা নেই। তাঁর পকেট শূন্য। কিন্তু প্রভুর শক্তি তাঁর উপর বিরাজ করছিল। একজন ব্যক্তিকে সুস্থ করার জন্য তিনি একদল উগ্র যিহুদি ধর্মীয় নেতার মুখোমুখি হন। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। তাঁর পকেট শূন্য ও তিনি রিক্ত বলেই তিনি প্রভুর উপর নির্ভর করেছেন। প্রভুর শক্তিতে তিনি নিজেকে সবল করেছেন, নিজেকে পূর্ণ করেছেন।

ঐশ প্রেম-প্রার্থীর ধ্যান : ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজের মতে, সাধু ইগ্নাসের অধ্যাত্ম সাধনা গ্রন্থের শেষ ধ্যানটি হচ্ছে ঐশ ভালবাসা অর্জনের জন্য ধ্যান। প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মার অবতরণের উপর ধ্যান করার পর এই ধ্যান করতে হয়। পুনরুত্থানের আনন্দ আস্বাদন করে ও করার জন্য এই ধ্যান করতে হয়। এই ধ্যানের প্রারম্ভিক দুইটি টীকা উল্লেখ করে যে, প্রকৃত ভালবাসা কথায় নয়, বরং কাজে প্রকাশ পায়। আর যিনি ভালবাসেন, তিনি তাঁর প্রিয়জনকে সব কিছু দিয়ে দেন। প্রিয়জন যদি ঈশ্বর হন, তবে ঈশ্বরকে আমরা তখন সব কিছু দিতে পারি (অধ্যাত্ম-সাধনা ২৩১)।

ঐশ প্রেম-প্রার্থীর ধ্যানের চারটি ধ্যেয় বিষয়:

১) গভীরভাবে যেন উপলব্ধি করি যে, আমি ভগবানের কাছ থেকে অনেক মুল্যবান দান লাভ করেছি। আমি যতটা নিতে পারি তিনি আমাকে ততটাই দেন। আমিও যেন ভগবানের কাছে আমার যা আছে তার সব কিছু উৎসর্গ করি *(অধ্যাত্ম-সাধনা ২৩৪)*। আমি যেন হই তাঁরই মন্দির স্বরূপ।

২) ভগবান শুধু নিজেকে দিয়েই ক্ষান্ত হন না। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও বিরাজ করেন *(অধ্যাত্ম-সাধনা ২৩৫)*। আমিও যেন অন্যকে যে উপহার দিই, সেই উপহারের মধ্যে বিদ্যমান থাকি।

৩) ভগবান শুধু নিজেকে দিয়ে ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান থেকেই ক্ষান্ত হন না। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনবরত কাজ করে চলেছেন *(অধ্যাত্ম-সাধনা ২৩৬)*। কর্ম যোগীর মত তিনি কাজ করে চলেছেন।

৪) সব কিছু আশীর্বাদ ও দান হিসাবে উপর থেকে নেমে আসে *(অধ্যাত্ম-সাধনা ২৩৭)*।

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজের মতে, ঐশ প্রেম-প্রার্থীর ধ্যানের তিনটি ধ্যেয় হচ্ছে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনবরত কাজ করে চলেছেন। চতুর্থ ধ্যেয় বিষয়, সব কিছু আশীর্বাদ ও দান হিসাবে উপর থেকে নেমে আসে, এই ধ্যেয় বিষয়টি আভিলার সাধ্বী তেরেজার ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে। এই পর্যায়ে আমরা আবার আমাদের নির্জন ধ্যানের গতিকে পশ্চাৎমুখী করি। আমরা পেছনে ফিরে তাকাই। এই পর্যায়ে আমাদের আহবান করা হয়, যেন আমরা সব কিছু ঈশ্বরের মধ্যে অন্বেষণ করি। সব কিছু ঈশ্বরের মধ্যে অন্বেষণ করে, আমরা যেন সব কিছু ঈশ্বরের মধ্যে দেখতে পাই। দেখতে পাই নিজেদের, এমনকি আমাদের নিজেদের পাপকে।

ফাদার টমাস এইচ গ্রীন এসজের মতে, ঐশ প্রেম-প্রার্থীর ধ্যানটি হচ্ছে একটা রূপান্তরমুখী প্রার্থনা যা শুধু নির্জন ধ্যানের নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যায় না। নির্জন ধ্যানের পরও প্রাত্যহিক জীবনে প্রবেশ করে তা চালিয়ে যেতে হয়। তখন কাজগুলো উৎকৃষ্ট ভাবে করা যায়। কাজগুলো করা যায় ভগবানের মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্য। প্রার্থনাতুল্য পাহাড় থেকে নেমে যেন কাজের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

প্রভু যিশু খ্রিস্টের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে ধ্যান করতে 'অধ্যাত্ম-সাধনা' গ্রন্থটি আমাদের আহবান জানায়। আর তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর পুনরুত্থান। একজন সাধক প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানসহ তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে ধ্যান করার পর ঐশ প্রেম-প্রার্থীর ধ্যানটি করে অনেক লাভবান হতে পারেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার জন্য একজন সাধক যেন প্রভু যিশু খ্রিস্টের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে ধ্যান করেন। আর 'অধ্যাত্ম-সাধনা' গ্রন্থটি একজন সাধকের সাধনায় অনেক সাহায্য করতে পারে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

1. Green, H. Thomas, SJ. A Vacation With the Lord. Indiana: Ave Maria Press, 1986.
২. লয়োলা, ইগ্নেসিয়াস। অধ্যাত্ম-সাধনা। কলিকাতাঃ জেভিয়ার প্রকাশনী, ১৯৭১।
৩. পবিত্র বাইবেল, জুবিলী বাইবেল (২০০৬)। ঢাকাঃ বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০৬। সাধু বেনেডিক্ট মঠের অনুবাদ, খুলনা।
৪. মঙ্গলবার্তা বাইবেল (৩ খণ্ড)। খ্রীস্তিয়া মিংঙো, এস.জে ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত। কলকাতা: জেভিয়ার প্রকাশনী, ২০০৩।

সকল অশুভ তিরোহিত হোক

জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রতিটি জাতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির মাধ্যমে খুঁজে পায় তার নিজস্ব অনুভূতি এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। আর ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মানুষ কিছু আনন্দ এবং স্মৃতিকে আপন করে নেয়। আর এ আপন করে নেওয়ার বিভিন্ন স্তর এবং সময়ের পথ ধরে সংস্কৃতির বিকাশ। বাংলাদেশী ও বাঙালী জাতি হিসেবে, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আমাদের এমন একটি উৎসব হল পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাঙালির সার্বজনীন ও প্রাণের উৎসব বাংলা নববর্ষ। অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ। পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কথায় আছে ১২ মাসে ১৩ পার্বণ। আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সবাই একে অপরের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মিলে মিশে আনন্দ ভাগাভাগি করে। যা নিয়ে বাঙালিরা বিশ্ব দরবারে অহংকার করতে পারে।

এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এক সময় এমনটি ছিল না। তখন নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হত। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ, কারণ প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের ঋতুর উপরই নির্ভর করতে হত। তখন প্রত্যেককে বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকত। এর পর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে এই পর্যায়ে এসেছে।

খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে "বঙ্গাব্দ" বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্তন ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দেও অনুরূপ কর্মকান্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'পহেলা বৈশাখ' বাংলাদেশের জাতীয় পার্বণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবার আগ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার ২১ এ ফেব্রুয়ারীর মতোই থামিয়ে দিতে চেয়েছে বৈশাখের উদ্‌যাপন। পাকিস্তান সরকারের এই অন্যায় আচরণের জবাব দিতেই "ছায়ানট" ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ, বাংলা ১৩৭২ সন) রমনার বটমূলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এসো হে বৈশাখ এসো এসো" গানটি দিয়ে সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু করে। বস্তুত এই দিনটি থেকেই "পহেলা বৈশাখ" বাঙালী সংস্কৃতির অন্যতম এক পরিচায়ক রূপ ধারণ করে।

যে দিন বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম মাস হয়ে এলো সেদিন হতেই বৈশাখের আনন্দটি নবান্নের আনন্দের চেয়েও আরও বড় আলাদা আঙ্গিক পেতে শুরু করে। মহাজন ও ব্যবসায়ীরা বৈশাখেই 'হালখাতা' অনুষ্ঠান চালু করেন। হালখাতা হলো যে বছরটি চলে গেল সেই বছরের হিসাবের যোগ বিয়োগ করে পুরনো খাতাটি তুলে রেখে নতুন বছরের প্রথম দিন নতুন খাতায় হিসাব চালু করা। প্রবীণরা বলেন, লাল সালু কাপড়ের মলাটে মোড়ানো নতুন এই হিসাব খাতায় উপরে লেখা হতো 'এলাহী ভরসা।' এই এলাহী শব্দটিও সম্রাট আকবরের 'তারিখ ই এলাহী' থেকে এসেছে বলে জানা যায়। বাংলা নববর্ষে ব্যবসায়ীদের 'হালখাতা' রীতি এখনও এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির আমেজ নিয়ে টিকে রয়েছে। খাতায় পুরাতন হিসেব মিটিয়ে নতুন বছরে নতুন করে সবকিছু শুরু করার জন্য এদিন ব্যবসায়ীরা সংশ্লিষ্টদের দাওয়াত দিয়ে এখনও মিষ্টিমুখ করান।

বৈশাখ হল গ্রামগঞ্জ থেকে শহর-বন্দর পর্যন্ত বাঙালি নারী-পুরুষ-শিশু, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে জাতীয়ভাবে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠার দিন। আবহমান কাল থেকে এ অঞ্চলের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে আসছে। শোভাযাত্রা,

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা এবং নারী-পুরুষের রং-বেরঙের পোষাক এবং সজ্জায় বর্ণিল হয়ে উঠে রাজধানীসহ গোটা দেশ। প্রাণ চাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে উঠে রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরের দৃশ্যপট। ভোর থেকেই নগরীর পথে পথে বাঙালি সংস্কৃতি লালনকারী আনন্দপিপাসু নগরবাসীর ঢল নামে। বস্ত্রেও থাকে বৈশাখী উৎসবের লাল-সাদার বাহারি নক্সার পোশাক। কোথাও কোথাও রং ছিটিয়ে উৎসব পালন করতে দেখা যায় তরুণ-তরুণীদের। বের হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঘরে ঘরে চলে পান্তা ভাতের সাথে ইলিশ মাছ, বিভিন্ন ধরনের ভর্তা এবং কাচা মরিচ পরিবেশন। আমাদের গ্রাম বাংলায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে যেসকল উল্লেখযোগ্য আয়োজন করা হয় : বৈশাখী মেলা, পান্তা ইলিশ, নৌকা বাইচ, লাঠি খেলা, হাতে বানানো পিঠা ও পুলির আয়োজন, বলি খেলা বা কুস্তি, নাগর দোলা ও পুতুল নাচ। আর বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকার বৈশাখী উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে উঠেছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখের সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। এই শোভাযাত্রায় গ্রামীণ জীবন এবং আবহমান বাংলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। শোভাযাত্রায় সকল শ্রেণী-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় বিভিন্ন রঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি। এছাড়াও ঢাকা রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা উল্লেখযোগ্য।

এখন নববর্ষ নতুন বছরের একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, এক সময় এমনটি ছিল না। শুধু ইউরোপেই নয় আজকাল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মোটকথা যেখানেই বাঙালি আছে সেখানেই উদযাপিত হয় পহেলা বৈশাখ। দেশ থেকে সেসব মেলার আয়োজকরা কিনে নিয়ে যান রকমারি পোশাক আশাক আর ঐতিহ্যবাহী খাবার। বিদেশের মাটিতে দেশি উৎসবে সেখানেও জমে ওঠে বাঙালির এক অনাবিল মিলন মেলা। অতীতের তুলনায় বর্তমানে বর্ষবরণ পালনে নান্দনিকতাই বেশি। এটি এখন বাঙালিদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাঙালির একান্ত নিজস্ব ঐতিহ্যের এই উৎসবটিতে বহিরাগত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে কলুষিত হচ্ছে। বিশেষ করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে নববর্ষের উৎসবে যন্ত্রণা হয়ে আসে আফ্রিকা থেকে আমদানি করা কর্কশ বাঁশি 'ভুভুজেলা'। ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্যমেলায়ও আজ নলখাগড়া বা বাঁশের বাঁশির জায়গা দখল করেছে ক্ষতিকর প্লাস্টিকে তৈরি এ 'ভুভুজেলা' বাঁশি। এছাড়া বিভিন্ন ক্লাব ও নামীদামি হোটেল ও রেষ্টুরেন্টে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে আয়োজন করা হয় রাতভর নৃত্য গানের আসর, যা জাতি হিসেবে আমাদের কাম্য নয়। এত কিছুর পরও বাংলা নববর্ষকে প্রাণের আনন্দে বরণ করবে এদেশের সকল মানুষ।

এবছর করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে ১৪২৭ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদযাপনে আগামী ১৪ এপ্রিল কোন অনুষ্ঠান না করার অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করে জারি করা হলো প্রজ্ঞাপন। উপসচিব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বুধবার (১ এপ্রিল) এ কথা জানানো হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, করোনাভাইরাসজনিত রোগ (কভিড ১৯)-এর বিস্তার রোধকল্পে জনসমাগম পরিহার করার লক্ষ্যে আসন্ন পহেলা বৈশাখ ১৪২৭ তারিখের সকল অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম স্থগিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এখানে সারা দেশে পহেলা বৈশাখের পাশাপাশি তিন পার্বত্য জেলায় 'বৈসাবি' উৎসব স্থগিতের ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশনা দেয়া হয়।

সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি, তিরোহিত হয়ে এদেশ সত্যিকার অর্থেই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। গত দিনের দুঃখ, ক্লেশ ও ব্যর্থতার গ্লানির কালো মেঘ সরিয়ে সাফল্যের নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হোক চারিদিক। সংস্কার মতাদর্শের মতো সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে সব মানুষের হৃদয়াবেগ থেকে উৎসারিত এক অতুলনীয় মহোৎসবে পরিণত হোক পহেলা বৈশাখ। করোনাভাইরাস নামক যে মহামারী সারা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তা অচিরেই দূর হয়ে যাক। সর্বত্রই বিরাজ করুক জীবনের জয়গান, এ-ই কামনা। স্বাগতম, সুস্বাগতম বাংলা নববর্ষ॥ ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=পহেলাবৈশাখ

https://adarbepari.com/events/pohela-boishakh

ভালবাসার স্বপ্ন

জেমস্ গমেজ (আদি)

প্রত্যহ বিকেলেই
তোমার আমার দেখা হয়
এ ইচ্ছামতির পারে।
শুধু ভালবাসার গল্পই করি।
বয়সটা তো ভালবাসা আর স্বপ্ন দেখার।
পুরো পৃথিবীটাই যেন রঙ্গিন লাগে।
তুমি আর আমি দু'জনেই তো
দেখি রঙ্গিন স্বপ্ন।
জান পূরবী
কি স্বপ্ন দেখছি এখন
দেখছি আলাউদ্দীনের যাদুর কার্পেটে
করে দুজন উড়ে যাব
ঐ নীল আকাশ পানে।
মন ভরে দেখে নেবো
রঙ্গিন পৃথিবীটাকে।
প্রথমেই তোমাকে নিয়ে যাব
আগ্রার তাজমহলে, সেখানে
সম্রাট শাহ্জাহানকে বলব
আপনার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাটা
সত্যিই ছিল গভীর।
তারপর যাবো-লন্ডনে
সেখানে দেখা করব রোমান্টিক কবি
পারসী শেলীর সাথে। তাকে বলব
LOVE PHILOSOPHI কবিতাটি
আমাদের দুজনের জন্য আবৃত্তি করতে
মন ভরে শুনবো।
তার সব প্রেমের কবিতা।
এরপর যাবো নিউইর্য়কে
সেখানে BROADWAY এর এর মঞ্চে
আমাদের দু'জনকে শোনাবে
সে হৃদয় ভরা প্রেমের গানটি
I WILL ALWAYS LOVE YOU
ম্যানহাটের এক ডায়মণ্ডের দোকান থেকে
এক রিং কিনে
পড়িয়ে দেব তোমর আঙ্গুলে
তোমাকে বলব WILL YOU MARRY ME?
এরপর যাদুর কার্পেটে করে
ফিরে আসব আবার ইচ্ছমতির তীরে।
সেখান থেকেই শুরু করব নতুন জীবন,
তোমাকেই ঘিরে।

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

"তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ, তুমি নেই
তুমি আছ, মন বলে তাই"

প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ
জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গোপাল মাধব বাড়ি
নতুন তুইতাল
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

আজও মনে পড়ে তোমায়, তুমি পিতার গৃহে থেকে সবই দেখছো। তোমাকে আমরা ভুলিনি। তোমার শেখানো নিয়ম-শৃঙ্খলা, রোজ প্রার্থনা সবই মেনে চলার চেষ্টা করি। তারপরও কখনো কখনো ভুল হয়। তোমার কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে, ফুল দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। তুমি ভালো আছ জেনেও আমরা তোমাকে হারানোর ব্যথা ভুলতে পারি না। আমাদের জন্য ও সকল বিশ্ববাসীর জন্য তুমি প্রার্থনা কর যেন আমরা ভালো থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা তোমাকে যেন চিরশান্তি দান করেন।

শোকার্ত

স্ত্রী : মনিকা গমেজ
বড় মেয়ে-জামাই : লিলি-প্রভাত, ক্লেস
ছোট মেয়ে-জামাই : বেবী-জন, কৃপা, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে-বউ : ডা: জেমস-দীনা, উপাসনা, ফ্রাঙ্কলিন
ছোট ছেলে-বউ : রিচার্ড-সন্ধ্যা, ধ্রুব, সৃষ্টি

২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

- মৃত্যুকালে এমএসএস (পুরকৌশল), BUET- এর ছাত্র ছিল।
- ১৫তম BCS পরীক্ষায় "গণপূর্ত" বিভাগে "সহকারী প্রকৌশলী" পদে চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হয় (মরণোত্তর ফলাফল প্রকাশ)।
- BUET-এ বিএসসি (পুরকৌশল) বিভাগ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে "১ম শ্রেণীতে" উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় ৬টি লেটারসহ স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- দাবা খেলায় স্কুল জীবনে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৭৭, ১৯৭৮ এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট এবং সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহর ইন্টার স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়।
- অবসরের বন্ধু ছিল বই আর ম্যাগাজিন। সে জাতীয় দৈনিক The Daily Star - এ নিয়মিত লেখালেখি করতো। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) এবং অন্যান্য সাময়িকীতেও তার অনেক লেখা ছাপা হয়েছে।

The Daily Star এবং BUET থেকে ইউকসু'র ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের একুশের প্রকাশনা "অনল জলের চিহ্নগুলো" থেকে হিউবার্টের একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা কবিতা নিচে পুনঃপ্রকাশ করা হলো :

The Prayer I say the Every Other day

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with Trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here. with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা : ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

মাদার তেরেজাকে উৎসর্গীত স্তোত্রাবলী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

বড় বড় স্বপ্নের বিপর্যয়ে,
বড় বড় প্রেমের পরাজয়ে মানুষ মুষড়ে পড়ে;
মানুষ অবুঝ হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে
এমনতর মন্বন্তরে --
যেন অশেষ নিষ্ঠুরতা লেগে আছে সময়ের খঞ্জরে
যার তীক্ষ্ণ আঘাতে মানুষ উবু হয়ে পড়ে;
এমন কোন নিবারণী শক্তি নেই যে তাকে ব্যর্থ করে
অবশেষে তোমার হাত থেকেই পুনর্বার জীবনীশক্তি
সঞ্চারিত হয়, মাদার তেরেজা
কী আশ্চর্য মন্ত্র আছে তোমার কাছে
তুমি বরাভয় দেখালে
এই সর্বত্র প্রসারিত অবিশ্বাসের মাঝে
স্বস্তিমাখা আওয়াজ উঠে,
'ঠাঁই আছে, ঠাঁই আছে'।
ক্রমশঃই একটি বিশাল হৃদয়
হয়ে উঠে একটি পরম আশ্রয়
অথচ সেই তুমি যখন কুমারী বয়সেই চক্ষুলজ্জা ফেলে
কোলে তুলে নিয়েছিলে যতো রাজ্যের অনাথ ছেলেপেলে
যখন কুষ্ঠরোগের অভিশাপে অভিশপ্ত
মানুষগুলিকেই স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত করেছিলে
তখন তোমার পাশে তেমন কেউ ছিলো না।
সেই সন্ধিক্ষণে সেই একাকিত্ব
তুমি বরণ করেছিলে অবহেলে।
এখন তোমারই অনাবিল ভালবাসার ছোঁয়ায়
অজাত কুজাত মানুষ হয়ে উঠে প্রিয় সমাদরণীয়
যখন তীক্ষ্ণভাষী নিন্দুকেরা খ্রিস্টের ক্ষমার বাণী আওড়ায়,
যখন উচ্ছৃঙ্খল বেলেল্লাপনায় ধুম লেগে যায়,
যখন স্বকথিত পুণ্যাত্মারা নির্দোষ কুমারীকে
জর্জরিত করে অপমান লাঞ্ছনায়,
শহীদের পবিত্র রক্ত দিয়ে হোলি খেলে পাশব উন্মত্ততায়,
তখন তুমি, হয়ে উঠো গাড় বিশ্বাসের স্বর্ণ-তরু,
তোমার সহজ কথায় করে অশেষ পুণ্য।

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

শোকাহত

প্রয়াত সিলভেষ্টার রোজারিও
জন্ম : ২০ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
করান, নাগরী

প্রয়াত রেখা রেবেকা রোজারিও
জন্ম : ২৮ জুলাই, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
৪৮, দক্ষিণ বেগুনবাড়ি, ঢাকা

তোমাদের দু'জনের এ সুন্দর পৃথিবী থেকে স্বর্গপানে চলে যাওয়া আমাদের মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও মেনে নিতে হয়, কারণ ঈশ্বর যে মহান। তাঁর অসীম দয়ায় ও ভালবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা দু'জনে আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, প্রতিটি নিঃশ্বাসে। ভুলবো না কোনদিন, ভোলা যায়ও না। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে
তোমারই সংসার-পরিজন
করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত মাইকেল পেরেরা
জন্ম : ৯ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রি:
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রি:
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

প্রয়াত আশালতা পালমা
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রি:
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি:
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

শাশ্বত মুক্তির লাভের আশায় বাবা-মা তোমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছ। আমরা বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে মহাশান্তিতে আছ। ব্যথিত হৃদয় আজো তোমাদের খুঁজে ফেরে, তোমাদের উপস্থিতি আজও আমরা উপলব্ধি করি। অনেক ভালবাসার জালে আমাদের জড়িয়ে গেলে। তাই তোমাদের স্মৃতি আজও বহন করে চলছি। তোমাদের সেই সরলতা, নির্মল হাসি, স্বল্পভাষি, কঠোর শ্রম, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়জন সন্তানকে অতি কষ্টে মানুষ করেছিলে তোমাদের ভালবাসা দিয়ে। তাই তোমাদের জীবনের মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের সন্তানেরা, মেয়ে জামাই, নাতী-নাতনীরা একসাথে বাড়ীতে আসলে, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলে সবচেয়ে খুশি হতে তোমরা। তোমাদের সেই ইচ্ছা আমরা পালন করতে চেষ্টা করে চলেছি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা তোমাদের আদর্শে সবার সাথে মিলেমিশে আনন্দে ও ভালবাসায় জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁরই কোলে অনন্তকালের জন্য স্থান দিক এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

বাবা ও মা'র মৃত্যুকালে যারা প্রার্থনা করেছেন, বিশেষ করে ফাদারগণ বাবা-মা'র আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
ছেলেরা, মেয়েরা, ছেলে বউয়েরা, মেয়ে জামাইরা
নাতী ও নাতী বউ : মারভিন-রোজী, জ্যাকসন, জয়, দীপ, হৃদয়, রত্ন, স্বারক, অর্ক, অগ্নি
নাতনী ও নাত জামাই : সুমি-প্রদীপ, মৌসুমি-কল্যাণ, জ্যাকলিন, মৌরী-দীপু, সিজি, জেসি, স্বর্ণা, হৃদি, গ্লোরিয়া ও হৃদিতা।

আর্নেষ্ট আলম ডি. কস্তা
সূর্যোদয় : ১ মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত : ১২ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন (যোহন ১১:২৫)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, ...
যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়, ...
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা, নিরালায় নিভৃতে বসে নীরবে শুনি তোমার মধুর কণ্ঠে গেয়ে যাওয়া কত গান।
বাতাসে ধ্বনিত রণিত কত কথা, পথ চেয়ে দেখি মন্থর গতিতে হেঁটে চলার অপূর্ব ছবি।
কে বলে তুমি নেই? তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় গভীরে।
তোমার পদচিহ্ন, হাতের ছোঁয়া, মধুর দৃষ্টি- সে তো চির জাগ্রত, চির জীবন্ত নীলাকাশের উজ্জ্বল তারার মত।
স্বর্গরাজ্যে তুমি রয়েছ পবিত্র খ্রিস্তের জয়গানে চির মুখরিত।
বাবা, তুমি মাকে ও তোমার সন্তানদের, নাতি-নাতনীদের, পুতি-পুতিনদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করো।

স্ত্রী	:	ফিলোমিনা নির্মলা গমেজ
ছেলে ও বৌমা	:	লরেন্স ডি. কস্তা ও এলিজাবেথ গমেজ
ছেলে	:	পঙ্কজ ডি. কস্তা
মেয়ে ও জামাই	:	উষা-প্রয়াত নিকোলাস, রীনা-সুশীল, শুভ্রা-জেমস, শিখা-সুজিত, সিম্মি-ডেনিস
মেয়ে	:	সিস্টার রেবা আরএনডিএম এবং সিস্টার মেরী আভা এসএমআরএ
নাতি-নাতবৌ	:	রুজভেল্ট-লিরা, ভিক্টর-রিমি, সুমন-প্রিয়াংকা, ব্রেইজ-মুমু, সুজন-সুইটি, প্রিন্স-পূজা, জেরী-কৃপা
নাতি-নাতনী	:	কেলভিন, জেসী, খ্রীষ্টফার, এলিসন, ম্যাথিও, ইভা, এমা, মারিসা, জেইডা, জেইক
পুতি-পুতিন	:	হৃদী, ক্রেইন, রাহী, এইডেন, নিকসন, অদ্রি, লিয়া, এডিনা, ইজাবেলা।

1275 Wantagh Avenue, Wantagh, New York, 11793, USA

"আপনার ও আপনার পরিবারের সুনিশ্চিত ভবিষ্যত গড়ার প্রত্যয়ে
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর যেকোন প্রকল্প গ্রহণ করুন"

শিগ্রই বিশ্ব করোনাভাইরাস মুক্ত হয়ে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক

ডিপোজিট পেনশন স্কীম

৩ বছর	৫ বছর	৮ বছর	১০ বছর
১০.৫০%	১১.৫০%	১২.৫০%	১৩.৫০%

মিলিয়নিয়ার স্কীম

মেয়াদান্তে বুঝে নিন - ১০ লক্ষ টাকা!!!
৫/৮/১০/১২/১৫
সুদের হার সর্বোচ্চ ১৩.৫০%

নয়নগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর
সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ ও সকল খ্রীষ্টভক্তদের
জানাই অত্র সমিতির কর্মকর্তা ও অফিস স্টাফদের
পক্ষ থেকে
'শুভ পাক্কা বাংলা নববর্ষ ১৪২৭'
এর আন্তরিক
প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক

মার্টিন এস. পেরেরা
সভাপতি

ফাষ্ট ডিপোজিট স্কীম

৫ বছর	৮ বছর	১০ বছর
১৩.৫০%	১৬.০০%	১৮.০০%

এফ.ডি.আর

৩ মাস	৭.৫০%	৬ মাস	৮.০০%
১ বছর	৮.৫০%	২ বছর	৯.০০%
৩ বছর	১০.০০%	৫ বছর	১০.৫০%
৭ বছর দ্বিগুণ		১০ বছর ৬ মাস তিনগুণ	

নয়নগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
ই-মেইল: ncccul@gmail.com, ও www.ncccul.com

অনলাইনে শিশু-কিশোরকে নিরাপদ রাখার কয়েকটি পরামর্শ

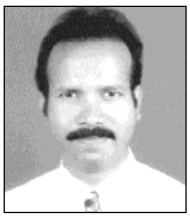

নোয়েল গমেজ

তথ্য-প্রযুক্তির অসীম দুনিয়ায় শিশু-কিশোরদের জন্য জানালা খুলে দিয়েছে ইন্টারনেট। আবার বাইরের কাউকে তাদের ওপর গোপন নজরদারির সুযোগও দিয়েছে। শিশু-কিশোররা অনলাইনে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে, অনেক সময় তাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

অনলাইনে তাদের সত্যিকারের পরিচয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না বলেই ম্যালওয়্যার আক্রমণ কিংবা বিপজ্জনক সিস্টেম হ্যাকিংয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়। এছাড়া পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট কিংবা হানাহানির দৃশ্য শিশু-কিশোরদের কোমল মনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে। অনেক সময় প্রযুক্তি জানা শিশুও যথেষ্ট দূরদৃষ্টির অভাবে বিপদে পড়ে যায়। অনেক শিশু গুজব ছড়ানো কিংবা মজা করে অন্যের একাউন্ট হ্যাক করার মতো বিষয়ে পড়তে পারে। তাদের কাছ থেকে ফোন বা ইন্টারনেট সংযোগ কেড়ে নেওয়াটা এর সমাধান হতে পারে না। বরং তাদের নজরদারির মধ্যে রেখে এবং নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায়।

শিশু-কিশোরদের অনলাইনে নিরাপদ ও সঠিকভাবে ব্রাউজিং শেখানোর দায়িত্ব অভিভাবকদের। প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে প্রযুক্তি বিষয়ে নিরাপদ থাকা ও ভালো আচরণ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। অনলাইন দুনিয়ায় কোনটি উচিত আর কোনটি অনুচিত সে বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক আচরণ শিক্ষা দেওয়া যায়। শিশু-কিশোরদের অনলাইনে নিরাপদ রাখার কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

নিরাপদ যন্ত্রের ব্যবহার: বাড়িতে সব ইন্টারনেট সুবিধার যন্ত্রগুলো নিরাপদে রাখুন। শিশু-কিশোর যদি শুধু ডেস্কটপ ব্যবহার করে, সেটিকেও নিরাপদ রাখুন। তারা সাধারণত তাদের মা-বাবার ফোন বা ল্যাপটপে গেম খেলে। আপনার মোবাইল, ল্যাপটপ, ট্যাব কিংবা ডেস্কটপে নিরাপদ সফটওয়্যার ইনস্টল করে রাখুন। হালনাগাদ নিরাপত্তা সফটওয়্যার সক্রিয় থাকলে এসব যন্ত্রে সহজ ভাইরাস ঢুকতে পারবে না।

নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ: আপনার কম্পিউটার প্যারেন্টাল কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করে রাখুন। প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সেট করে দিন। শিশু-কিশোরদের এ্যাডমিন পাসওয়্যার্ড জানানোর প্রয়োজন নেই।

ব্রাউজার ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিরাপদ রাখুন: শিশুদের উপযোগী ব্রাউজার ও তাদের গেম খেলা বা প্রকল্প তৈরির জন্য আলাদা ব্রাউজার ঠিক করে দিন। শিশুদের ই-মেইল একাউন্ট কিংবা সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটে প্রাইভেসির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। তারা যাতে শুধু পরিচিতজনের সঙ্গেই যোগাযোগ করে, সে বিষয়টিতে পরামর্শ দিন। জিপিএস, ওয়েবক্যাম নিষ্ক্রিয় করে রাখুন। পপ-আপ ব্লক করে দিন।

সময় সঠিক করে দিন: আপনার সন্তান যখন কিশোর বয়সী, তখন তারা গেম খেলা ও ভিডিও দেখতে বেশি আগ্রহী হয়। যখন-তখন যাতে ইন্টারনেটে যেতে না পারে, সে জন্য ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখুন। কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবহার করুন এবং তারা কোন ওয়েবসাইটে যাবে তা ঠিক করে দিন। যখন তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করবে, সে সময়ও নির্ধারণ করে দিন।

দরকারি শিক্ষা: বাস্তব জীবনে যে বিষয়গুলো শেখার প্রয়োজন, অনলাইন দুনিয়ায় সেই বিষয়গুলো শিক্ষা দিন। শিশুকে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দিন। সংযত হয়ে কথা বলা কিংবা কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে, সে বিষয়টিও শিখিয়ে দিন।

যোগাযোগ: নিয়মিত শিশুর খোঁজখবর রাখুন। তার সঙ্গে কথা বলুন এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। শিশুর অনলাইন দুনিয়ার অভিজ্ঞতা শুনুন। সাইবার জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাকে জানান বন্ধুদের কেউ এরকম কোনো সমস্যায় পড়েছে কি না, তা জেনে নিন।

নজরদারিতে রাখুন: আপনার শিশুকে একা একা পার্কে কি খেলতে দেবেন? নিশ্চয়ই না? অনলাইনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি মনে রাখুন। শিশুর ব্যবহৃত কম্পিউটার অবশ্যই সবার সামনে রাখবেন আর কম্পিউটারের স্ক্রিনটি দরজা বরাবর রাখবেন। অর্থাৎ শিশুদের আপনার চোখের আড়ালে কোনরূপ যোগাযোগ করতে দেবেন না।

বিনামূল্যে কিছু পাওয়ার লোভ সামলান: অনলাইনে কোনো কিছু বিনা মূল্যে পাওয়ার অফার সম্পর্কে শিশুদের সতর্ক করুন। আমরা সবাই যেমন জানি, বিনা মূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, তাদেরও সেটা বোঝান। বিনা মূল্যে ওয়ালপেপার, গেম, পোস্টার প্রভৃতি ডাউনলোড না করার জন্য বলুন। এ ধরণের অফারের সঙ্গে ম্যালওয়্যার থাকতে পারে যা বিভিন্ন তথ্যের বিনিময়ে ইনবক্সে চলে আসে।

শোবার সময় মোবাইল নয়: ঘুমানোর আগে কোনো যন্ত্র, এমনকি মোবাইল ফোন যেন শিশুর সঙ্গে না থাকে, সে বিষয়টি খেয়াল রাখুন। রাতের খাবারের পর কোনো চ্যাটিং, টেক্সটিং কিংবা ই-মেইল দেখা না হয়, সেটিই নিয়ম করে দিন।

নৈতিক শিক্ষা: শিশুদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই নৈতিক শিক্ষা দিন। চ্যাটরুমে যাওয়া, কোনো কিছু কপি পেস্ট করে নিজের নামে চালানো, অবৈধভাবে কোনো গান বা ছবি ডাউনলোড করতে না করুন। কারও সঙ্গে অনলাইনে বিবাদ না করতে, কাউকে গালি না দিতে, বয়স লুকিয়ে কোনো সামাজিক যোগাযোগের সাইটে একাউন্ট তৈরি করতে কিংবা কোনো গুজব ছড়ানোর বিষয়ে তাদের সতর্ক করুন।

চিন্তা করতে শেখান: অনলাইনে শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় শেখাবেন। থামো, চিন্তা করো তারপর যোগাযোগ করো। কোনো বিষয়ের জবাব দিতে, টুইট করতে, কোনো কিছু লাইক করতে বা পোস্ট করার আগে সেটি ঠিক হচ্ছে কি না, তা একটু সময় নিয়ে ভেবে তারপর করা উচিত।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্টারনেট হচ্ছে শিক্ষা, বিনোদন ও যোগাযোগের চমৎকার একটি উৎস। এটি ভবিষ্যতের একটি টুল। ইন্টারনেট থেকে শিশুকে শিক্ষা নিতে বাধা দেবেন না। এর পরিবর্তে তাদের এই টুলটির যথাযথ ব্যবহার কীভাবে করা যায়, তা বুঝতে শিশুদের সাহায্য করুন॥

তথ্য সংগ্রহ - অনলাইন ডেস্ক। ❑

সাদাবিষ!

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

বর্তমান সময়ে খাবার আমাদের জন্য একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরাপদ খাবার আমাদের সবার জন্য দরকার। আমাদের অসুস্থতার একটি বড় কারণ বিষযুক্ত খাবার। তারমধ্যে ৫টি খাবারকে এখন বলা হচ্ছে সাদাবিষ। এদের সবগুলোই দেখতে সাদাবলে এদের সাদা বিষ বলে । আজকের দিনে এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এ খাবারে ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিকস্, উচ্চ কোলেস্টেরল, হাড়ের সমস্যা প্রভৃতি হয়ে থাকে। সাদা বিষ নামক খাবারগুলো হলো:

১. দুধ
২. সাদাভাত
৩. লবণ
৪. চিনি ও
৫. আটা বা ময়দা

১. দুধ

বাচ্চা ও বয়স্কদের জন্য দুধ উৎকৃষ্ট খাবার। স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের আমরা দুধ খেতে চাপ দেই। অসুস্থ ও বয়স্কদের আমরা দুধ খেতে বলি। কারখানার পাস্তুরিত দুধ ক্ষতিকর। কারখানায় দুধ পাস্তুরিত করতে গিয়ে দুধের উপকারী ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এর উপকারী ভিটামিন এ, বি ১২ ও সিও তাতে থাকেনা। এর স্বাভাবিক এনজাইম ও ফসফেট যা শরীরে ক্যালসিয়াম গ্রহণে সহযোগিতা করে, তা নষ্ট হযে যায়, ফলে দুধের ক্যালসিয়াম যা আমাদের হাড় গঠনে সহায়তা করতো, তা আর কাজ করে না। আবার সাম্প্রতীক সময়ে গরু মোটা তাজাকরণে ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক ও হরমোন এ দুধে আমাদের ক্ষতি করে। তাই কারখানায় পাস্তুরিত দুধ আমাদের না খাওয়াই উওম।

২. সাদা ভাত

সাদা ভাত আমাদের প্রধান খাবার। আমরা মাছে ভাতে বাঙ্গালী। কবি বলেছেন - আমার ছেলে যেন থাকে মাছে ভাতে। দুধ ভাত আমাদের খুব প্রিয় খাবার। ইদানিং বাজারে সাদা চকচকে চালের খুব কদর। কিন্তু রিফাইন ও পলিশ/ চকচক করা এসকল চালে রঞ্জক পদার্থ মিশানোতে তা আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ভাতে অনেক শর্করা থাকে। বয়স যত বেশী হয়, তত এসব চাল কম খেলে ভালো। যখন আমরা কায়িক পরিশ্রমে কম করি, বসে বসে টেবিলে কাজ করি, তখন বেশী বেশী ভাত খেলে তা আমাদের শরীরে মেদ বাড়ায়। কায়িক পরিশ্রম মেদ ঝরানো যায়। কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে বেশী সাদা ভাত খেলে আমাদের অল্প বয়সে স্থূলতা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিকস্, উচ্চ কোলেস্টেরল এর ঝুঁকি বাড়ে। আমাদের দেশে এসব রোগে মধ্যবয়সে মৃত্যুর হার ৫০% বেড়েছে।

৩. লবণ

রাজার ছোট মেয়ে রাজাকে বলেছিল - আমি তোমাকে লবণের মত ভালোবাসি। এ গল্প আমরা সবাই জানি। আমরা লবন দিয়ে কাঁচা আম বা আমরা খেতে খুব ভালোবাসি। বরিশালের বিখ্যাত উক্তি - মনু ডাইলে লবন দেছ না দেবা। খাবারে লবণ কম হলে আমরা খাবারে স্বাদ পাইনা-আমরা আবার লবণ দিয়েতা স্বাদ করে খাই। দৈনিক আমাদের খুব অল্প পরিমাণে শরীরের জন্য লবণ লাগে, যা প্রায় ১৮৬ মিলি গ্রাম যা ১ চামচের প্রায় ০.০৩৭ ভাগ, যা খুবই অল্প। আয়োডিন যুক্ত লবণ অল্প পরিমাণে ভালো। আমাদের তরকারিতে যে পরিমাণ লবণ থাকে, তা আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা অনেক সময় লবণ গরম করে খাই। এতে লবণের গুনাগুনে কোন ঘাটতি হয় না। লবণে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড থাকে। এটি অতিরিক্ত খেলে আমাদের উচ্চ রক্তচাপ বা হাইব্লাড প্রেসার হতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি ৫ জন তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ৩ জন উচ্চ রক্তচাপ বাহাইব্লাড প্রেসারে ভুগে, যা সে জানেনা। উচ্চ রক্তচাপ বা হাইব্লাড প্রেসারে প্রথমদিকে কখনো কখনো ঘাড়ে ব্যথা করে বা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা বোঝাই যায় না। এর ফলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিকস্, উচ্চ কোলেস্টেরল এর ঝুঁকি বাড়ে। কারখানায় লবণ রিফাইন করাতে অনেক ক্ষেত্রে আয়োডিন নষ্ট হয়, ফ্লোরাইডযুক্ত হয়, যা অতিরিক্ত হলে আমাদের শরীরে সমস্যার তৈরী করে। বাজারের লবণে লেবু দিলে যদি তা নীল হয়, তবে বুঝতে হবে তাতে আয়োডিন আছে।

৪. চিনি

আমরা সবাই মিষ্টি ভালোবাসি। কি রকম মিষ্টি চাই - আমরা বলি চিনির মতো মিষ্টি। ভাত খাবার পর একটু মিষ্টিমুখ হলে খুব ভালো হয়। কিন্তু চিনি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ভালো না, যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নিয়মিত আসছে এবং এ বিষয়ে আমরা অনেকেই সতর্ক আছি। চিনিতে তো কোন ভিটামিন বা মিনারেল থাকেই না, বরং থাকে উচ্চ ক্যালরীবা শক্তি, যা আমাদের ওজন বাড়ায় ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। এটি আমাদের বিপাক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে ও ডায়াবেটিকস বা বহুমূত্র রোগ তৈরীতে ভূমিকা রাখে। বাজারের রিফাইন চিনি খুব খারাপ। চিনি আমাদের ওজন বাড়ায় এবং তাতে আমাদের শরীরে ক্যান্সার তৈরী করে। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে ক্যান্সার অনেক বেড়েছে। তার একটি বড় কারণ - অনেক বেশী চিনি বা চিনিজাত খাবার খাওয়া। প্রাকৃতিক মিষ্টি মধু ভালো। তবে যথা সম্ভব চিনি পরিহার করা দরকার।

৫. ময়দা

ময়দা দিয়ে পরোটা, বিস্কুট, কেক, পিজা, চানাচুর, নুডুলস, পাস্তা, বার্গার ইত্যাদি বহু সুস্বাদু খাবার হয়। এসব আমাদের সবার খুব প্রিয়। অতিথি আপ্যায়নে বা বিকালে বা সকালের নাস্তায় এসবই আমাদের উপাদেয় খাবার। কিন্তু ময়দা বা রিফাইন আটা আমাদের জন্য মোটেই স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার নয়। ময়দাতে রিফাইন করার সময় বিটামিন বা মিনারেল নষ্ট হযে তা স্বাস্থ্য হানিকর হয়। তাই এটি পরিহার করা ভালো।

তাই আসুন, সতর্ক হই, খাবারে সাবধান থাকি। কি খাচ্ছি, সজাগ থাকি। সাদাবিষ থেকে নিরাপদে থাকি। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাই, খাবারের জন্য বেঁচে থাকিনা॥ ❑

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

যিশুর দেশে ক্রুশের পথে

ডেভিড স্বপন রোজারিও

(কানেকটিকাট, আমেরিকা)

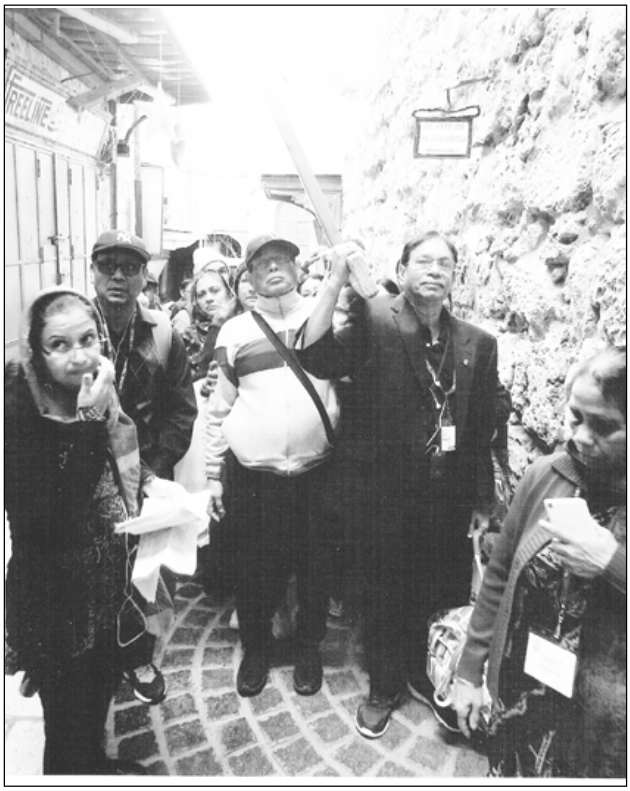

"পবিত্র ভূমিতে" তীর্থভ্রমণে এসে, যে স্থানটি আমার হৃদয়কে দারুণভাবে ছুঁয়ে গেছে, তা হলো প্রাচীন জেরুশালেমের "VIA DOLOROSA" ল্যাটিন এ শব্দের অর্থ "Way of Sorrow"। এই সেই ঐতিহ্যবাহী পথ, যে পথ দিয়ে প্রভু যিশু নগ্ন পায়ে, ভারী ক্রুশ বহন করেছিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি-২, শনিবার, ২০১৯, আমরা ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদী) এর নেতৃত্বে পায়ে হেঁটে "হেরোদ গেট" দিয়ে প্রাচীন রোমান দূর্গ অ্যান্তনিয়ায় প্রবেশ করলাম, যেখানে রোমান গভর্ণর পিলাত বিক্ষুব্ধ জনতার সামনে প্রভু যিশুর বিচার করেছিলেন। অবশ্য সেই দূর্গ আজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমাদের সবার মনে একটা টান টান উত্তেজনা ছিল। আজ প্রভু যিশুর রক্তাক্ত পথে "জীবন্ত ক্রুশের পথ" করবো। কিন্তু সে পথটুকু কেমন, তা পূর্বে জানা ছিলো না। সমতল থেকে পাথুরে রাস্তাটি ক্রমান্বয়ে প্রাচীরের বাইরে "গলগাথা" নামক পর্বতের দিকে উঠে গেছে। পথটি খুব বেশী চওড়া নয়। চারিদিকে বাড়ীঘর, দোকান-পাট, আগেও যেমনটি ছিলো, ঠিক আজও তেমনি আছে। দু'হাজারেরও অধিক বছর পূর্বে, প্রভু যিশু যে পথ বেয়ে ভারী ক্রুশ বহন করে গলগাথা পর্বতের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ঐতিহ্যবাহী পথে জীবন্ত ক্রুশের পথ করবো, ভাবতেই দারুণভাবে রোমাঞ্চিত হলাম।

পোন্তিয় পিলাত রোমানদের ৫ম রাজ্যপাল (Governor) ছিলেন যার ওপর যুদেয়ার শাসনভার ছিল। তিনি রোম সম্রাট টিবারিয়াস (Tibereous) এর অধীন ছিলেন। পিলাত প্রভু যিশুর বিচার করে ঘৃণিত ক্রুশীয় মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিলেন। পিলাতের আদালত চত্বরের বাইরে থেকে, আমাদের ক্রুশের পথ শুরু হবে। এখানে কাঠের ক্রুশ ভাড়া পাওয়া যায়। গাইড, একটি ক্রুশ আমাদের জন্য ভাড়া করে রেখেছিলেন। ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদী), পিলাতের বিচার দরবারে, প্রভু যিশুর যে প্রহসনমূলক বিচার হয়েছিল, তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং ক্রুশের পথের প্রার্থনা শুরু করেন। বলাবাহুল্য, প্রতিটি স্টেশনে হাঁটু দিয়ে প্রার্থনা ও গান করতে করতে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম।

দ্বিতীয় স্থান যে ঘটনাকে স্মরণ করে, ঐতিহ্যগতভাবে কিছু কিছু মূল্যবান স্থাপনা এখনো সেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। রয়েছে বৃহৎ প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক চার্চ "Church of the Flagellation" অর্থাৎ যেখানে যিশুকে থামের মধ্যে বেঁধে অমানুষিকভাবে "কশাঘাত" করা হয়েছিল, চার্চটি সেই ঘটনার কথা স্মরণার্থে নির্মিত হয়েছিল। বিখ্যাত ইতালিয়ান স্থপতি Anthoneo Bar Luzzi ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চার্চটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।

এ প্রাচীন পথে ইতিহাসের নানা জানা অজানা, দুঃখ বেদনার কথা ফিসফিস করে কথা বলে, মনে হয় কান পাতলে সে সব শোনা যাবে। সময়ের ব্যবধানে সে সমস্ত কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, আবার খনন কাজের মাধ্যমে তা উদ্‌ঘাটিত খ্রিস্টাব্দে যেমন রোম সম্রাট হ্যাড্রিয়ান ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দুটি তোরণ নির্মাণ করেছিলেন। একটি তার জেরুশালেম বিজয় উদযাপন উপলক্ষে, অপরটি "Arch of Ecco Home" যার অর্থ "এই দেখ সেই লোক"। বাঁ পাশের তোরণটি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে তবে ডান পাশের তোরণটি "Church of the Sister Zion" এর পাশে এখনও অবশিষ্ট আছে। Fr. Alfonse Relisone ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে জেরুশালেম আসেন। তিনি Ecco Home – এর পাশের প্রাচীন বিজয় তোরণের জমিটি ক্রয় করে, ধ্বংস স্তুপের মাঝে খনন কার্য চালিয়ে, ১৮৫৯-১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে "সিস্টার জিওন কনভেন্টটি পুনঃ নির্মাণ করেন।

তৃতীয় স্থানে আমরা স্মরণ করি প্রভু যিশুর ১ম বার ভূমিতে পড়ে যাবার ঘটনা। যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন সেই স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য, ১৫শ শতাব্দীর আরমানিয়্যান ক্যাথলিকদের একটি ছোট চ্যাপেল ছিলো। সেই প্রাচীন চ্যাপেলটি ১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোলিশ সৈন্যদের সহযোগিতায় পুনর্গঠন করা হয়। সময়াভাবে চমৎকার চ্যাপেলটি দেখার সুযোগ হয়নি আমাদের। যিশু যেমনি সমতল পথ থেকে ধীরে ধীরে ক্রুশ নিয়ে পাহাড়ী পথে ওঠেছিলেন আমরা তা অনুসরণ করি। পুত্রকে দেখার আশায় স্নেহময়ী জননী যে স্থানটিতে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেই সাক্ষাতের পবিত্র স্থানটির স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ছোট উপাসনা গৃহ নির্মাণ করা হয়। পোলিশ, প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী Ziceliensky গির্জার প্রবেশ দ্বারের উপর

চমৎকারভাবে প্রভু যিশু ও মা মারীয়ার মূর্তি স্থাপন করেন। সিরেন থেকে জেরুশালেম অত্যন্ত ব্যস্ততম রাস্তা, দু'ধারে সারিবদ্ধ দোকান, নানা পণ্য এখানে বেচাকেনা হয়। এখনো তা হয়। যিশুর সাথে ভেরোনিকার সাক্ষাৎকারের ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ আশ্চর্যভাবে অঙ্কিত যিশুর পবিত্র মুখচ্ছবির পবিত্র কাপড়টি এখন রোমের সেন্ট পিটার্স বেসিলিকাতে সংরক্ষিত আছে। তবে সাক্ষাতকারের স্থানটি স্মৃতিময় করে রাখার জন্য এখানে "Church of the Holy Fare " নামে একটি চার্চ নির্মাণ করা হয়। "Little Sisters" গ্রীক সম্প্রদায় এর পরিচালনা করে থাকেন। ভেরোনিকার কবরস্থান এখানে আছে। ধারণা করা হয় গির্জাটি সাধ্বী ভেরোনিকার বাড়ীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। গভীর ভক্তিভরে আমরা ক্রুশের পথের প্রথম অংশ শেষ করি ইথিওপিয়ান অর্থডক্স সম্প্রদায়ের চার্চের গেটের বাইরে, একটি সমতল স্থানে এসে। শেষ হলো আমাদের জীবন্ত ক্রুশের পথ। এখানে আমরা অনেক গ্রুপ ছবি তুললাম। ঠিক এখান থেকে ক্রুশের পথের অবশিষ্ট স্টেশনগুলো আমাদেরকে নিয়ে যাবে যিশুর সমাধিগৃহে। আমরা লাইন দিয়ে ইথিওপিয়ান চার্চের ভিতর প্রবেশ করলাম। সরু রাস্তা। অত্যন্ত প্রাচীন গির্জাঘর, বিশপ মিসা দিচ্ছিলেন। সারাদিন ধ্যান, প্রার্থনা ও আরাধনা চলে। মিসা শেষে বিশপের সাথে আমরা ছবি তুললাম। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন। সাধারণত অর্থডক্সরা ভীষণ ধর্মভীরু, শাস্ত্র বিশ্বাসী, নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান।

পিলাতের আদালত প্রাঙ্গন থেকে প্রভু যিশু গলগাথা পর্যন্ত অত্যন্ত ভারী একটি ক্রুশ বহন করেছিলেন। কশাঘাতে রক্তক্ষরণের দরুণ দুর্বল হয়ে, তিনবার মুখ থুবরে পাথরে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপরও ক্ষত বিক্ষত দেহে, যন্ত্রনায় তিনি কাতর হয়ে পথ চলতে দু'পাশের নানা মানুষের টিটকারী, ভৎর্সনা সহ্য করেছেন। তবুও তিনি বিরক্তি, ঘৃণা বা হিংসার ভাব প্রকাশ করলেন না। তাঁর হৃদয় উৎপীড়কদের প্রতিও প্রেমে ভরপুর ছিল।

আর আমরা হাল্কা একটা ক্রুশ ছয়/সাতজন বহন করেছি। তাও আবার বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে। কোন শারিরীক বা মানসিক কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু প্রতিটি ষ্টেশনে প্রার্থনা ও ধ্যান করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে বাধাগ্রস্থ হয়েছি। অপরিসর উঁচু নিচু পাথুরে রাস্তা, দু'পাশে দোকানী ও খদ্দেরদের হৈ চৈ চিৎকার, পণ্য বোঝাই গাড়ীর চলাচল, নোংরা পরিবেশে ঠিকমত হাঁটু দেবার কোন উপায় ছিল না। তদুপরি এদের তাচ্ছিল্য ভাব দেখে দুঃখ পেয়েছি। আমার মর্মবেদনা এখানেই, এরা জানে না, মহান ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু এ পথ দিয়ে নগ্ন পায়ে হেঁটে গেছেন। কতো মহান, কতো পবিত্র এ পথ।

ইথিওপিয়ান অর্থডক্স চার্চের অলিগলি পথ পাড়ি দিয়ে, যিশুর সমাধি গৃহ "(The Holy Sepulchre) এর সামনে বিশাল এক চত্বরে নেমে এলাম। এখানে ভীষণ ভীড়। তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীর কেউ সমাধিগৃহে ঢুকছে আর বের হচ্ছে, কেউ ছবি তুলছে কেউবা বসে গল্পগুজব করছে এলাহি সব কাণ্ড কারখানা।

আমরা দলবদ্ধভাবে বিশাল একটি দরজা দিয়ে যিশুর সমাধিগৃহে প্রবেশ করলাম। বিশাল সমাধিগৃহে প্রবেশ করে, আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কি জাঁকজমক এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্র স্থান।

প্রথমেই যে দৃশ্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তা হলো, ক্রুশ কাষ্ঠের উপর যিশুকে শুইয়ে, ঘাতক সৈন্যরা অতি নিষ্ঠুরভাবে তার দু'হাত ও দু'পায়ে পেরেক বিদ্ধ করছে। অত্যন্ত মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক সেই ঘটনা। মহান শিল্পী তার নিপুণ হাতের স্পর্শে করুণ সেই ঘটনা রং তুলি দিয়ে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে স্থানে নির্মম ঘটনাটি ঘটেছিল, সেখানে সুসজ্জিত একটি পাথরের বেদী, নত মস্তকে সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি, সামান্য কাঁটার আঘাতে আমরা আর্তনাদ করে উঠি। আর ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু কি নিদারুণ বেদনা সহ্য করেছিলেন, ভাবতে গায়ে শিহরণ জাগে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সারা বিশ্বে খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্রতম গির্জাগুলোর মধ্যে অন্যতম গির্জা "The Holy Sepulchre" ।

যে গলগাথায় প্রভু যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, ঠিক সেই পর্বতের ওপর জাঁকজমকপূর্ণ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম, কারণ এখানে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়। গ্রীক অর্থডক্স সম্প্রদায় সকল দর্শন প্রার্থীদের অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। সৌধের ভেতরে প্রবেশ করে মোহমুগ্ধ হয়ে পরলাম। একটি চমৎকার সুসজ্জিত মসৃণ পাথরের বেদী, আর ঠিক তার উপরে ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যিশু ক্রুশে দণ্ডায়মান। পাশে করুণাময়ী মার একটি মূর্তি। এখানে ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং কঠোর নিরবতা পালন করা হয়। বেদীমূলে দাঁড়িয়ে, মনে মনে ভক্তিমূলক গানটির কয়েকটি লাইন গাইলাম–

"ক্রুশের কাছে রাখ হে, যিশু নিত্য আমায়,
বহু মূল্য স্বাস্থ্যকর স্তোত্র বহে তথায়।
ক্রুশেতে ক্রুশেতে শ্লাঘার বিষয় আমার
তাঁরি গুণে নির্ভয়ে যাব নদীর ওপার।"

স্মৃতি সৌধ থেকে বের হয়ে আমরা এলাম একটি লম্বা পুরু মসৃণ গোলাপী পাথরের (Polished Pink Lime Stone) সামনে। যিশুর মৃত্যুর পর আরিম্যাথিয়ার যোসেফ ও নিকোদিম যেখানে যিশুকে সমাধি দিয়েছিলেন সেই পাথরের উপর দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে স্বর্গসুখ লাভ করলাম। দেহ রোমাঞ্চিত হল, ভাবে বিভোর হয়ে কল্পনায় ক্ষত বিক্ষত দেহটি স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। আমার স্ত্রী ও সহ যাত্রীরা যে যা পারলো এমনকি গায়ের ওড়না, শাল, রুমাল পাথরে ছোঁয়ায়ে পবিত্র করে নিলো।

ওখান থেকে আমরা যিশুকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিলো, সেখানে একটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। দীর্ঘদিন যুদ্ধ বিগ্রহে ও ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তারই এক খন্ড প্রাচীন পাথর একটি কাঁচের ঢাকনা দিয়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং ঠিক তার পাশেই একটি ছোট গুহার মত যিশুর কবরস্থান। যিশুর আসল কবরস্থান মাটির নীচে দেবে যাওয়ায় তার উপরে এই কবরস্থানটি । এখানে প্রচণ্ড ভীড়, লম্বা লাইন, একে একে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে স্থানটি স্পর্শ করে অমরত্ব লাভ করলাম।

আমরা সমাধিস্থলের (Holy Sepulchre) বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে ঘুরে দেখলাম এবং পবিত্র স্থানগুলির স্পর্শে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। এখানে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট চ্যাপেল আছে। সব সময় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের, একটার পর একটা মিসা লেগেই আছে। আগে থেকে গাইডের মাধ্যমে "বুক" করলে সুবিধা হয়। একটি ছোট চ্যাপেলে ফাদার স্ট্যানলী গমেজ (আদী) মিসা উৎসর্গ করলেন। এই প্রথমবারের মতো স্বেচ্ছায় সেবকের দায়িত্ব পালন করতে পেরে বেশ আনন্দিত হয়েছি।

পবিত্র স্থানটি ঘুরে যা দেখলাম, শুনলাম এবং স্পর্শ করলাম সেই হৃদয়গ্রাহী স্মৃতি আমৃত্যু মনে থাকবে। এরপর ছুটে চললাম, অন্য তীর্থস্থানে নতুন কোন পবিত্র স্থান দেখার আশায়॥ ❑

ভারত তুমি, প্রেমের তীর্থভূমি

ফাদার গৌরব জি. পাথাং সিএসসি

ভারত শুধু একটি দেশের নাম নয়, এটি একটি প্রেমের তীর্থভূমি। মানবপ্রেম ও ঐশপ্রেমের প্রকাশ এই ভারতে। আগ্রার তাজমহল আজও মানবপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ও উজ্জ্বল নিদর্শন। হিন্দুদের তীর্থস্থান কাশি, গয়া, বৃন্দাবন, খ্রিস্টানদের তীর্থস্থান ভ্যালেংকিনির মা মারীয়া, চেন্নাইয়ের (মাদ্রাজ) সাধু টমাসের গির্জা, ব্যান্ডেলের মা মারীয়া ও গোয়ার সাধু ফ্রান্সিসের তীর্থস্থান ঐশপ্রেমের প্রকাশ ও নিদর্শন। বিগত ৫ই জানুয়ারি ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের পুনে শহরে পা রেখেছিলাম। মহারাষ্ট্র মূলত মারাঠি অধ্যুষিত প্রদেশ, ক্রিকেট, চলচ্চিত্র (বলিউড), অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত প্রদেশ। এ প্রদেশ ৬টি বিভাগ ৩৬টি জেলা নিয়ে গঠিত। এ প্রদেশের রাজধানী মুম্বাই (বোম্বে) যা আরব সাগরের সাতটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। খ্রিস্টানদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও গির্জাও রয়েছে এই প্রদেশে। আছে উপাসনার বিভিন্ন রীতিল্যাটিন, সিরো মালাবার (সাধু টমাস) ও সিরো মালাঙ্কারা। বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি আমরা ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার মোট ২৩ জন পুনে থেকে মুম্বাই গিয়েছিলাম ঘুরতে। মুম্বাই গিয়ে গেইটওয়ে অব ইন্ডিয়া দেখে খুবই ভাল লেগেছে। আরব সাগরের নীল জলে যেন ভাসছে গেইটওয়ে অব ইন্ডিয়া এবং হোটেল তাজমহল যে হোটেলটি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছিল এবং কমপক্ষে ১৬৭জন লোক মারা গিয়েছিল। এখান থেকে কিছু দূরে রয়েছে মেরিন ড্রাইভ। সেখানে অনেক গাঙচিল উড়ে বেড়ায় যা পর্যটকদের অনেক আকর্ষণ করে, আনন্দ দান করে। বান্দ্রা সমুদ্র সৈকতের অনতিদূরেই আছে খ্রিস্টানদের অনেক গির্জা ও প্রতিষ্ঠান, নায়ক-নায়িকাদের বাসা। ভাগ্য প্রসন্ন হলে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে। আছে জাদুঘর, সমুদ্র সৈকত,যানজট নিরোসনের জন্য তৈরী সি-লিংক রোড। যাবার সময় মনে হবে সাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছি। এ এক অনন্য অনুভূতি। পুনে থাকতেই মনে মনে স্থির করলাম তাজমহল ও সাধু ফ্রান্সিসের দেহাবশেষ দেখেই দেশে ফিরব। সেই আশা নিয়ে ১ মার্চ দিল্লী যাওয়ার জন্য পুনে বিমানবন্দরে গেলাম ভোর সাড়ে পাঁচটায়। চেক-ইন, বোর্ডিং হয়ে যাওয়ার পর জানানো হল বিমান ছাড়তে দুই ঘন্টা

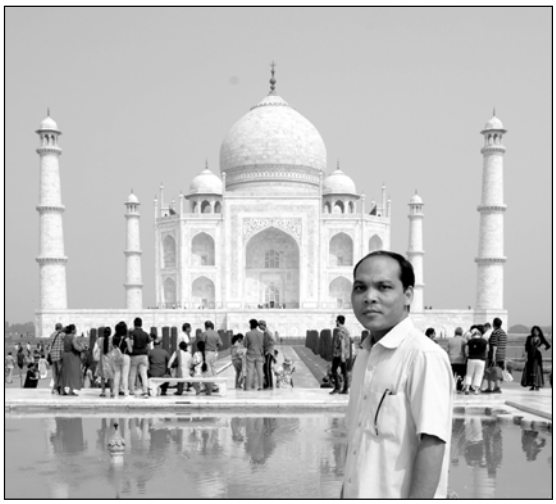

দেরী হবে। দুই ঘন্টা পর জানানো হল বিকাল দুইটায় ছাড়বে কিন্তু সেই বিমান ছাড়ল বিকাল চার ঘটিকায়। যাত্রার প্রথম দিনেই আট ঘন্টা বিমানবন্দরে বসে থাকতে হল। যাই হোক, রাত সাড়ে নয়টায় দিল্লী গিয়ে পৌছলাম। পরদিন ২রা মার্চ ভোর ৬টায় নিউ দিল্লি থেকে পানিকার বাসে ক'রে উত্তর প্রদেশের আগ্রার উদ্দেশে রওনা দিলাম। দিল্লির আকাশ তখন হালকা কুয়াশায় ঢাকা। রাস্তায় যানজট নেই বললেই চলে। তাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি পেরিয়ে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে গিয়ে উঠলাম। রাস্তায় কোন যানজট নেই, হর্ণ নেই, ড্রাইভারদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নেই কে কার আগে যাবে, গাড়ি তার আপন গতিতে আপন ট্র্যাকে ছুটে চলেছে। রাস্তায় দোকানপাট, দাঁড়ানো গাড়ি, বিকল গাড়ি কোনটাই নেই। রাস্তা দখল করার মত কোন কিছুই নেই সেখানে। এমনকি ফিলিং স্টেশনও রাস্তা থেকে দূরে। রাস্তা মানেই শুধু রাস্তা। শুধু মাঝে দু'য়েকবার থামতে হল রাস্তার টোল দেওয়ার জন্য। পথে পানিকার ট্র্যাভেল এজেন্সীর গাইড আমাদেরকে জুতা ঢাকার জন্য ১০ রুপির বিনিময়ে কভার কিনতে বললেন কারণ এ কভার ছাড়া তাজমহলের ভিতরে অর্থাৎ সমাধিতে প্রবেশ করতে দেবে না। আমরা সকাল দশটায় গিয়ে আগ্রায় পৌঁছলাম এবং বাস থেকে নামলাম। ট্যুরিষ্ট গাইড বললেন সেখান থেকে বিশেষ যানবাহনে যেতে হবে তাজমহল গেইটে। জনপ্রতি ১০ রুপি দিয়ে বিশেষ যানবাহনে ক'রে তাজমহল গেইটে পৌঁছলাম। গেইটে গিয়ে দেখি অনেক লোকের ভিড়। বাংলাদেশ সার্কভূক্ত দেশ হওয়ায় ৭৪০ রূপি দিয়ে টিকেট কেটে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। টিকেট কাউন্টার থেকে আমাকে একটা টিকেট ও একটা টোকেন দিল। সেই টোকেন একটা মেশিনে দিতেই গেইট খুলে গেল। প্রবেশ পথে আমাদের সবকিছু চেক করা হল। নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা তাজমহলের গেইট পার হতেই ঘুরে বেড়ানোর এক স্বাধীনতা উপলব্ধি করলাম। কিন্তু তখনও তাজমহল দৃষ্টির অগোচরে, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অন্যান্য ঘরগুলো এমনভাবে তাজমহলকে আগলে রেখেছে উঁচু গম্বুজ ছাড়া পুরো তাজমহলকে বাইরে থেকে দেখা যায় না, তার সৌন্দর্য দেখা যায় না। কয়েক মিনিট হেঁটে যেতেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছলাম। প্রবেশ পথ অতিক্রম করতেই তামহলের দৃষ্টিনন্দন অপরূপ সৌন্দর্য চোখের সামনে মেলে দিল। দূর থেকে তাকিয়েই রইলাম। কি অপরূপ সুন্দর! কি মনমুগ্ধকর! কি মনোহর!

আমাকে আরো কাছে এগিয়ে যেতে হবে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে হবে। সম্মুখে রয়েছে জলের ফোয়ারা ও ফুলের বাগান। এসব পার হয়ে কভার দিয়ে জুতা ঢেকে তাজমহলের ভিতরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে তাজমহলের

পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা নদী চোখে পড়ল পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অমর প্রেমের এক অবারিত স্রোতধারা প্রেম যমুনা। সেই যমুনার প্রেম স্রোতে বিধৌত একটি নগরীর নাম আগ্রা।। দেখে মনে হল যমুনার যৌবন হারিয়ে যাচ্ছে। এতদিন এ নদীর নাম শুনেছি, দেখার ইচ্ছা মনে পুষে রেখেছি কিন্তু দেখে মন ভরল না। তার সৌন্দর্যে ভাটা পড়েছে। নদীর জল শুকিয়ে গেছে। শুধু কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, যমুনা নদী তাজমহলের সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করেছে। তাজমহলের সমাধিতে যাওয়ার জন্য টিকেটের প্রয়োজন হয়। টিকেট দেখিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম শাহজাহান ও মমতাজের সমাধি। শাশ্বত প্রেমের এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ এই তাজমহল। সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটি হল এই শ্বেত পাথরের তাজমহল। কারুকার্য ও মূল্যবান পাথর দিয়ে নির্মিত এই সমাধি সৌধ তাজমহল। বলা হয়, মোঘল সম্রাট শাহজাহান তার তৃতীয় স্ত্রী মমতাজকে খুবই ভালবাসতেন। মমতাজ ৩৯ বছর বয়সে ১৪তম সন্তানের জন্ম দেবার সময় মারা যান। পরে তাকে জয়নাবাদ বাগানে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু ছমাস পরে পুনরায় আগ্রার এই তাজমহলে সমাধিস্থ করেন। পরে তিনি তার স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাজমহল নির্মাণ শুরু করেন ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আর সমাপ্ত হয় ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে। বিশ হাজার শ্রমিক এই নির্মাণ কাজে জড়িত ছিলেন। তাজমহল নির্মাণের জন্য পাঞ্জাব থেকে আনা হয় স্বচ্ছ মার্বেল পাথর, চীন থেকে সবুজ পাথর, তিব্বত থেকে স্বচ্ছ নীল পাথর এবং শ্রীলঙ্কা থেকে নীলমণি। এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২৮ ধরণের মূল্যবান পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয় তাজমহল। হাত দিয়ে তাজমহল স্পর্শ করলাম, অনুভব করলাম প্রেমের ছোঁয়া। প্রেমের ছোঁয়ায় যেন শিহরিত হলাম। দেখতে দেখতে কখন যে সময় পার হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। ফিরে এসে প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। যেখানে লেখা আছে-

"কেমনে জানিল শাহ্‌জাহান, প্রেম
পৃথিবীতে মরে যায়!
(তাই) পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল
পাষাণে লিখিয়া হায়!
... তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ
তার প্রাণ
অন্তরে তার মমতাজ নারী,
বাহিরেতে শা-জাহান।"
মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল
(যেন) বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম,
ফিরদৌসের একমুঠো প্রেম,
আজো করে ঝলমল।"

তাজমহলের অনতিদূরেই আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে আগ্রা ফোর্ট বা আগ্রার দুর্গ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রাঙা বেলে পাথরের তৈরী এই আগ্রা দুর্গ দেখে অভিভূত হলাম। এই দুর্গটি মোঘল রাজবংশের রাজকীয় আবাসস্থল ও মোঘল স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। এখানে থেকেই মোঘল সম্রাট বাবর, আকবর ও তার বংশধরেরা রাজত্ব করতেন। দুর্গের অভ্যন্তরে মোঘল সম্রাটদের তৈরী প্রাসাদ, মিনার, মসজিদ, খাসমহল, সমাধি, বাগানসহ অনেক কিছুই দেখার আছে। আছে মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যের সংমিশ্রনে তৈরী নানা স্থাপনা, কারুকার্য ও নিদর্শন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো আগ্রা দুর্গকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আগ্রা দুর্গ দেখার পর রওনা দিলাম কৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরার উদ্দেশ্যে। মথুরা স্থানটি আগ্রা-দিল্লী মহাসড়কের মাঝখানে। আগ্রা থেকে দুই ঘন্টার পথ অতিক্রম করে আমরা মথুরায় গিয়ে পৌছলাম। গাড়ির ভিতরেই ট্যুরিস্ট গাইড আমাদেরকে বলে দিলেন, মন্দিরে টাকা ছাড়া কোন কিছুই সঙ্গে নেওয়া যাবে না। গাড়ির ভিতরেই মোবাইল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র রেখে মন্দিরের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে আমাদের চেক করা হল। তারপরই ভেতরে যাবার অনুমতি পেলাম। মন্দিরে গিয়ে লক্ষ্য করলাম পূজারীরা কৃষ্ণের আরাধনায় ব্যাকুল। কেউ কীর্তন করছে, কেউবা নাম জপ করছে, কেউবা বসে ধ্যান করছে। এখানে তিনটি বড় বড় মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে যা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এই স্থানে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, ঈশ্বর ও তাঁর ভক্তের প্রেমের কথা মনে পড়ে গেল। একদিকে শাহজাহান-মমতাজের প্রেম, অন্যদিকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আমাকে আন্দোলিত করে তুলল।

পরদিন ৩ মার্চ দিল্লি থেকে গোয়ায় গেলাম। গোয়া বিমান বন্দর থেকে নেমে ওল্ড গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দুই ঘন্টা পর পুরাতন গোয়ায় অবস্থিত বম জিজাস ব্যাসিলিকায় পৌছলাম। এটি ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে, এটি এখন ইউনেস্কো কর্তৃক ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্যাসিলিকাটির ভিতরে গিয়ে মানুষের ভীড় দেখলাম। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দেহাবশেষ দেখার জন্য হিন্দু, মুসলিম, শিখ অনেকেই এসেছেন। আমিও তাদের সাথে গিয়ে দাঁড়ালাম। ব্যাসিলিকার মূল বেদীর পাশে চ্যাপেলে রাখা হয়েছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দশ বছর অন্তর অন্তর নিচে নামানো হয় এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। চ্যাপেলের পাশে আর্কাইভের মধ্যে আছে সাধু ফ্রান্সিসের কফিনসহ তার কিছু স্মৃতিচিহ্ন। ব্যাসিলিকার বিপরীত পাশে সাধ্বী ক্যাথেরিনার ক্যাথেড্রাল অবস্থিত, এটি তৈরী হয়েছিল ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভিতরে আছে বড় একটি সোনালী ঘন্টা যা বিশ্বের মধ্যে একটি অন্যতম, বেদী, ক্রুশ প্রভৃতি। বাইরে আছে প্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন। বারুদ (গান পাউডার) তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত বড় বড় পাথর, বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় পাথর। ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকত ও পাহাড় পেরিয়ে রাইয়াতে 'সোসাইটি অব ডিভাইন ওয়ার্ড' সেমিনারীতে গেলাম। পরদিন সকালে বেড়িয়ে পড়লাম নীল সাগরের সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্র সৈকত কত পরিস্কার, সমুদ্রের জল সচ্ছ নীল, নেই ফটোগ্রাফার, ভিক্ষুক, হকারদের কোন উৎপাত, ডিস্টার্ব। এখানে বুক ভরে শ্বাস নেওয়া যায়, শুয়ে শুয়ে সূর্যস্নান করা যায় ও স্বল্পবসনে সমুদ্রে নামা যায়। আনন্দের সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দুঃখ ভোলা যায়। তাই তো দেশ বিদেশের বহুলোক গোয়ার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে আসে॥ ❑

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

বৈপরীত্য

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

স্কুল-জীবন থেকেই কল্লোলের বই পড়ার নেশা। প্রচুর বই পড়তো ও'। যাকে বলা হয় বইয়ের পোকা। বইয়ের সাথে সখ্যতার কারণে কল্লোলের কল্পনার পৃথিবীটা বয়সের তুলনায় খানিকটা বড় হয়ে গিয়েছিলো। বাস্তবতার সাথে কল্পনাগুলো মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হতো ও'র। নুনও নেই পান্তাও নেই সংসারে সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। অগত্যা কি আর করা। হৃদয়ের জানালায় প্রতিনিয়ত কড়া নাড়তে থাকা ইচ্ছেগুলোর পাশ কাটিয়ে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেছিলো কল্লোল।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ থেকে সুনামের সাথে পাশ করে একটি আন্তর্জাতিক দাতা-সংস্থায় কাজ করছে কল্লোল। যা এক সময় ও'র জন্য ছিলো অলীক কল্পনা। কষ্ট করে একটি জানালা খুলতে পারলে আরেকটি জানালা খোলার কাছকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক দাতা-সংস্থার চাকুরীটি কল্লোলের ছোট বেলার ইচ্ছেগুলোকে ডানা মেলে উড়ার পথ করে দেয়। চাকুরীর সুবাদে ও' এখন দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগও হয় মাঝে-মধ্যে।

অফিসের কাজে একটি বিভাগীয় শহরে এসেছে কল্লোল। চাকুরীতে যোগদানের পর এটা কল্লোলের একশততম ফিল্ড-ভিজিট। ফিল্ড-ভিজিটের সেঞ্চুরী বলা যেতে পারে। ঘোরাঘুরিতে কল্লোলের ক্লান্তি নেই। চাকুরী জীবনের একটি বড় সময় মাঠে-ঘাটে ঘুরেই কেটে গেল ও'র। ছাত্র-জীবনে ছিলো বই পড়ার নেশা। পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য কোন বই না পড়লে ও'র পেটের ভাত হজম হতো না। এখন হয়েছে ঘোরাঘুরির নেশা।

কল্লোলের স্ত্রী প্রায়শঃ বলে- ফিল্ড ভিজিটে এমন কি মধু আছে? পরিচিত সব মানুষ ফিল্ড-ভিজিট এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। আর আমার সাহেবের নিকট ফিল্ড-ভিজিট যেন আনন্দ-যাত্রা।

কল্লোল মনে মনে হাসে আর বলে, ফিল্ড-ভিজিটে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার যে কি আনন্দ. তা তুমি বুঝবে কি করে? তুমি তো নিজের গ্রামের গাছ-গাছালি, মেঠো পথ, পাখির কল-তান, নতুন ফসলের মৌ মৌ ঘ্রাণ, রসে ভেজানো চিতই পিঠার স্বাদ নেয়ারই চেষ্টা করনি কখনো? আর এসব করার সময়ই বা কোথায় তোমার? তোমার জগৎ তো এখন স্মার্টফোন আর ফেসবুকের বিভ্রান্তির জালে বন্দি হয়ে আছে।

বিলাসিতাপূর্ণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত নয় কল্লোল। কোন জেলা বা বিভাগীয় শহরে এলে ও' সচরাচর মাঝারি মানের কোন একটি আবাসিক হোটেলে উঠে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও'র কোন বাছ-বিচার নেই। যে কোন খাবার রান্না হলেই হলো। খেয়ে না খেয়ে বড় হলে যা হয় আর কি। সকাল আটটার মধ্যে নাস্তা-পর্ব সমাপ্ত করে কাজে নেমে পড়া কল্লোলের দীর্ঘদিনের অভ্যাস।

আজ ও'র ফিল্ড-ভিজিটের শেষ দিন। বিকালের ফ্লাইটে ও' ঢাকা ফিরে যাবে। তাই একটু আগে-ভাগেই নাস্তা করার উদ্দেশ্যে ও' হোটেল থেকে হাঁটা-দূরত্বের রেস্টুরেন্টটির দিকে রওয়ানা দেয়। একটু এগুতেই রেস্টুরেন্টের সামনে একটি জটলা দেখা যায়। বাঙালির অসীম কৌতুহল। কল্লোলের কৌতুহলী মন জোরে পা চালাতে তাগাদা দেয় । জোরে পা চালায় কল্লোল।

একটি দশ-বারো বছরের ছেলেকে রেস্টুরেন্টের পাশের পিলারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। খালি গা। ছেড়া-প্যান্ট পরনে। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল। ঠোঁট কেটে রক্ত বের হচ্ছে। প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফা মারধরের প্রস্তুতি চলছে। রেস্টুরেন্টের মালিক বিপুল উৎসাহে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কল্লোল মালিকের দিকে এগিয়ে যায়।

ঃ কি হচ্ছে, মামা?

ঃ আর বইলেন না, মামা। চিটারে-বাটপারে দ্যাশটারে শেষ কইরা দিলো। দেহেন তো, এ পিচ্চি পোলাডার নাস্তার বিল অইছে পচিশ টাকা। আর ও' দিচ্ছে দশ টাকা। টাকা নাই তো খাইলি ক্যান্? টাকা না পাইলে এইডারে ছাড়ুম ক্যাম্‌তে, আপনিই কন্ মামা?

কল্লোল ভালোভাবে ছেলেটির দিকে তাকায়। মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটি। অনেক কষ্টে হয়তো দশ টাকা জোগাড় করে খেতে এসেছিলো। ক্ষুধার জ্বালায় খাওয়ার সময় বিল-এর চিন্তা মাথায় আসেনি। মাত্র পনেরো টাকার জন্য একটি ছোট অসহায় ছেলেকে বেঁধে বাবার বয়সী লোকগুলো মার-ধর করছে। এ মুহূর্তে ছেলেটির মানসিক ও শারীরিক অবস্থা কি হতে পারে? কল্লোল ভাবতে পারে না।

সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। রাগে শরীর কাঁপতে থাকে ও'র। জটলার লোকদের উদ্দেশ্যে বেশ জোরের সাথে ও' বলে-

ঃ আপনাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যে জীবনে কখনো চিটারী-বাটপারী করেননি? বা ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে চিটারী-বাটপারী করবেন না? এমন কেউ যদি থাকেন, তাহলে থেমে আছেন কেন? মারেন ছেলেটাকে। ক্ষুধার্ত, অল্প-বয়সী অসহায় একটি ছেলেকে নির্যাতন করে বেশ মজা পাচ্ছেন, তাই না? নিজেকে খুব বাহাদুর মনে হচ্ছে? আশে-পাশে প্রতিনিয়ত এত অন্যায়-অনাচার হচ্ছে। বাহাদুরীটা সেখানে দেখাচ্ছেন না কেন?

কল্লোল অবাক হয়ে দেখে, চোখের পলকে জটলা ফাঁকা হয়ে গেছে। ও'র সামনে কয়েকজন কাস্টমার, ছোট ছেলেটি আর রেস্টোরেন্টের মালিক ছাড়া আর কেউ নেই। রেস্টুরেন্টের মালিক ও'কে কিছু বলতে চায়। মালিককে থামিয়ে কল্লোল বলে-

ঃ আপনি তো বললেন, চিটারে-বাটপারে দেশটারে শেষ করে দিলো। তো আপনি এর আগে কতজন চিটার-বাটপাররে এভাবে সাজা দিয়েছেন? তাতো পারেন না। বাহাদুরী ফলাচ্ছেন এ ছোট অসহায় ছেলেটির উপর। বুকে হাত দিয়ে বলেন তো, আপনি কি কাস্টমারদের সাথে চিটারী করেন না? কাউকে অভিযুক্ত করার আগে নিজের দিকে তাকাবেন। নিজে শুদ্ধ কিনা দেখবেন।

একটানা কথাগুলো বলে মালিকের হাতে পনেরো টাকা গুঁজে দিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে কল্লোল রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আসে।

দুপুরে অন্য একটি রেস্টুরেন্টে খেতে আসে কল্লোল। রেস্টুরেন্টটি বিমানবন্দরে যাওয়ার রাস্তার পাশে। ছোট পরিপাটি রেস্টুরেন্ট। মালিক এক হাতে সবদিক সামাল দিচ্ছে।

চৈত্রের দুপুর। বাইরে কাঠ-ফাটা রোদ। রাস্তার দিকে মুখ করে বসে খাচ্ছে কল্লোল। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের একটি মেয়ে ইতস্ততঃ করতে করতে রেস্টুরেন্টে ঢুকে। হাতে একটি স্বচ্ছ ফাইল। ভিতরে সার্টিফিকেট এবং আরও কিছু কাগজ দেখা যাচ্ছে। মুখে প্রসাধনের চিহ্ন-মাত্র নেই। তবে ঘাম আর রোদমাখা মুখটি বেশ মায়াময়।

ঃ মামা, এখানে ভাত বা রুটি কিছু পাওয়া যাবে? মেয়েটি ক্লান্ত-স্বরে জিজ্ঞেস করে।

ঃ হ্যাঁ, ভাত পাবেন। বলুন কি কি খাবেন। ডাল, ডিম, সব্জি, রুই মাছ, পাবদা মাছ, ব্রয়লার মুরগীর মাংস।

ঃ শুধু ডাল-ভাত কত মামা?

ঃ ডাল, ভাত, সব্জি চল্লিশ টাকা।

ঃ আমার সব্জি চাই না। আমারে শুধু ভাত, ডাল দিন। ত্রিশ টাকায় হবে তো?

ঃ আচ্ছা বসুন, দিচ্ছি।

মেয়েটির মোবাইল বেজে উঠে। হারানো দিনের গান। কল্লোলের ভীষণ প্রিয়। হঠাৎই হৃদয়ে একটি ভালো লাগার আবেশ তৈরী হয়। যেন তীব্র গরমে এক পশলা বৃষ্টি। মেয়েটি মোবাইল হাতে নেয়। আস্তে আস্তে কথা বলে- হ্যাঁ, মা বলো। হ্যাঁ, চাকুরীর ইন্টারভিউ ভালো দিয়েছি। হ্যাঁ, খেয়েছি। ভাত-মাছ। তুমি ওষুধগুলো খেয়েছো তো? হ্যাঁ, আমি চারটার ট্রেন ধরবো। ভাইয়ার তো আগামীকাল পরীক্ষা নেই। ও'কে স্টেশনে থাকতে বলো। আচ্ছা রাখি।

মোবাইল রেখে মেয়েটি কয়েক সেকেন্ড বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো অসুস্থ মা আর স্কুল পড়ুয়া ভাইয়ের সু-দিন এনে দেয়ার স্বপ্নগুলো হৃদয়ে নাড়া দিচ্ছে।

অচেনা, অজানা মেয়েটির প্রতি কল্লোলের একটা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা ভাব চলে আসে। কি যেন বলে এ বয়সটাকে? বালিকার চেয়ে বড়। যুবতীর চেয়ে ছোট। মনে মনে মেয়েটির প্রতি শুভ কামনা জানায় কল্লোল।

রেস্টুরেন্টের মালিক ভাতের থালা সাজিয়ে মেয়েটির সামনে রাখতে রাখতে বলে- আমি ভুল করে সব্জিটা দিয়ে ফেলেছি। আপনি খেয়ে নিন। ত্রিশ টাকাই দিয়েন।

ঃ কিন্তু, আমি তো শুধু ডাল-ভাতই চেয়েছি।

ঃ আমি একদম ভুল করে সব্জিটা দিয়েছি। খেয়ে নিন্, প্লিজ। আমারই তো ভুল। ত্রিশ টাকা নেবো আমি। আপনি না খেলে খাবারটা নষ্ট হবে।

কল্লোলের খট্‌কা লাগে। সত্যিই কি মালিক ভুল করে সব্জিটা দিয়েছে? বিল পরিশোধের সময় কল্লোল মালিককে জিজ্ঞেস করে- সত্যিই কি আপনি ভুল করে সব্জিটা দিয়েছেন?

মালিক আস্তে আস্তে বলে- শুধু ব্যবসায় লাভ খুঁজলে হবে মামা? মাঝে মাঝে এরকম ভুল করার সুযোগও তো খুঁজতে হবে। দেখুন মামা, মেয়েটি কত তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে। কাউকে কিছু দিতে পারা বা খানিকটা তৃপ্তি দেয়ার মধ্যে যে সুখ, তা আপনি টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না মামা। আর একটা কথা মামা, আমার রেস্টুরেন্টে এ মুহূর্তে আপনি আর মেয়েটি ছাড়া আরও প্রায় পনেরো জন খাচ্ছে। কেউ বিষয়টি খেয়াল করেনি। শুধুমাত্র আপনি খেয়াল করেছেন। এই যে বিষয়টি শুধুমাত্র আপনি খেয়াল করেছেন এতে আমি মোটেও অবাক হইনি। আপনাদের খ্রিস্টানদের মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি এবং সেবার মনোভাব অন্যদের তুলনায় একটু বেশীই আছে মামা।

কল্লোল অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে- কিভাবে বুঝলেন, আমি খ্রিস্টান।

রেস্টুরেন্টে সারাদিন কতই না বিচিত্র ধরণের মানুষ আসে। আমাদের চোখ-কান অন্যদের তুলনায় একটু বেশীই খোলা রাখতে হয়, মামা। আপনি খাওয়া শুরু করার আগে প্রার্থনা করেছেন, আমি খেয়াল করেছি। আমি আপনাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। এইতো কয়েকদিন পর আপনারা ইস্টার-সানডে পালন করবেন। পবিত্র বাইবেলও আমি কিছু কিছু পড়েছি, মামা। গেৎসিমানী বাগানে যখন যিশু-খ্রিস্ট অর্থাৎ আমাদের ঈসা নবীকে ধরিয়ে দেয়া হলো তখন তাঁর একজন শিষ্য ছোরা দিয়ে যিশু-খ্রিস্টকে ধরতে আসা একজন সৈন্যের কান কেটে দিলো। যিশু-খ্রিস্ট তাকে থামিয়ে দিলেন এবং উঠে এসে শত্রু সৈন্যটির কান লাগিয়ে দিলেন। এর মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য তিনি ভালোবাসার মহান বার্তা রেখে গেলেন, মামা। অনেক কথা বলে ফেললাম মামা। কিছু মনে করবেন না।একটানা কথাগুলো বলে রেস্টুরেন্ট মালিক তার কাজে মন দেয়।

মালিকের কথাগুলো কল্লোলের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। ও' বিল দিতে ভুলে যায়। টাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। মালিক অবাক হয়ে বলে- কি মামা, টাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন যে? বিল দিবেন না?

কল্লোল বিল পরিশোধ করে গাড়িতে উঠে। ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি বিমান বন্দরের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। দুই পাশে চোখ জুড়ানো দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। মাঠ পেরিয়ে সবুজে ঢাকা গ্রাম। কোন কিছুর দিকে কল্লোলের ভ্রুক্ষেপ নেই। সকালে সাক্ষাৎ পাওয়া নিষ্ঠুর রেস্টুরেন্ট মালিক এবং সবেমাত্র সাক্ষাৎ পাওয়া মহান রেস্টুরেন্ট মালিকের চারিত্রিক বৈপরীত্য কল্লোলের হৃদয় আচ্ছন্ন করে রাখে। এ আচ্ছন্নতা কাটতে খানিকটা সময় লাগবে বৈকি! ❑

তমসার কাল

খোকন কোড়ায়া

যিশু হৃদয়ের ছবির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে কেয়া - হে প্রভু, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি এ পাপীর প্রতি দয়া কর, হতভাগিনীর প্রতি করুণা কর, অপূর্বকে তুমি সুস্থ কর। তুমি অসীম দয়াময়, বিশাল শক্তিধর, তোমার কাছেতো কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তুমি শুধু মুখ তুলে তাকালেই অপূর্ব সুস্থ হয়ে যাবে, ফিরে আসবে মৃত্যুর দুয়ার থেকে।

দু'দিন আগে অপূর্ব'র বাবা ফোন করে কেয়াকে জানায় খবরটা। এই প্রথম কেয়ার সঙ্গে কথা বললেন তিনি। কেয়া হ্যালো বলতেই ও প্রান্ত থেকে ভদ্রলোক বললেন - আমি নিউইয়র্ক থেকে অপূর্ব'র বাবা বলছি। আজ দুপুরে অপূর্ব খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো খুব। ও নিজেই হাসপাতালে ফোন করে, তারা এ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে ওকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। যাওয়ার আগে ও তোমাকে ফোন করেছিলো, ঢাকায় তখন অনেক রাত, তুমি হয়তো ঘুমিয়ে ছিলে। পরে আমাকে ফোন করে বলে, আমি যেন তোমাকে জানাই। কেয়া ঘুমায়নি, মোবাইলটা কিভাবে যেন সাইলেন্ট হয়ে ছিলো।

- বাবা, এখন কেমন আছে অপূর্ব? এত বছর পর কাউকে বাবা বলতে পাড়লো কেয়া।

- তোমাকে আমি মিথ্যে বলবোনা মা। অপূর্বকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন, কণ্ডিশন খুব বেশী ভালো না। প্রার্থনা কর, আমি ফোন করবো আবার।

- ফোন রেখে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলো কেয়া, ভাগ্যিস মা ছিলেন ওর পিছনে।

এই চার মাস ধরে প্রতিদিনই ফোন করে অপূর্ব। অন্তত এক ঘন্টা কথা বলে ওরা। কেয়া মাঝে মাঝে দুষ্টামি করে বলে, প্রতিদিন ফোন না করলে চলে না? অপূর্ব বলে, না একেবারেই চলে না। তোমার সঙ্গে একদিন কথা না বললে মনে হবে দিনটিই অর্থহীন। তোমাকে তো বলেছি বাব-মার সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার পর মেয়েদের আমি খুব ভয় পেতাম। যার কারণে আমেরিকার মত একটা দেশে বাস করেও আমার কোন মেয়ে বন্ধু

ছিলো না। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে মেয়েদের সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেছে। এখন ভাবি সব মেয়ে এক রকম না। আর এখন এটাও মনে হয় সব দোষ আমার মায়ের নয়, বাবারও হয়তো কিছু ভুল ছিলো।

অপূর্ব'র সঙ্গে কেয়া'র দেখা হয়েছে মাত্র চার মাস আগে। একদিন দুপুরে কেয়ার মামা এসে ওর মাকে বললেন - কেয়ার জন্য একটা ভালো পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। ছেলে আমেরিকায় থাকে, ডাক্তার। ওখানেই সেটেল্ড। একটা সমস্যা অবশ্য আছে, ছেলের বাবা-মার ডিভোর্স হয়ে গেছে, তারা দুজনেই আবার বিয়ে করে আলাদা সংসার করছে। তবে ছেলের ব্যাপারে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। ছেলে খুবই ভালো। চরিত্রবান, কোন বদ নেশা নেই। প্রতিষ্ঠিত, ভালো চাকরি করে, নিজের ফ্ল্যাটও আছে। দিদি বিয়েটা হলে তুমিও যেতে পারবে আমেরিকায়। সারা জীবনতো কষ্ট করলে শেষ বয়সে অন্তত সুখের মুখ দেখবে। মা বললেন - আমার সুখ নিয়ে ভাবি না, মেয়ে সুখী হবে কিনা সেটাই বড় কথা। তা কবে আসবে ওরা? মামা বললেন- ছেলের কাকা-কাকীমা থাকে ঢাকায়, ছেলে ওদের বাসায়ই উঠেছে, আমি বলেছি আজ সন্ধ্যায় আসতে।

বাবা-মার একমাত্র মেয়ে কেয়া। বাবা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে চাকরি করতেন। পোস্টিং ছিলো নারায়ণগঞ্জে। ওখানেই থাকতো ওরা। সুখেই ছিলো কিন্তু একটানা সুখতো মানুষের কপালে নেই। কেয়ার বয়স তখন দশ, একদিন ভোরে বাবার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। আধ ঘন্টার মধ্যে বিনা নোটিশে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। তারপর থেকে মেয়েকে নিয়ে আদরে-অনাদরে ছোট ভাইয়ের বাসায়ই আছেন কেয়ার মা। কেয়া ইকনমিক্সে অনার্স কমপ্লিট করেছে। একটা চাকরিও করছে। এদিকে মা আর মামা উঠে পড়ে লেগেছেন বিয়ে দেয়ার জন্যে।

ওরা সন্ধ্যায় আসে। ছেলে সুদর্শন। দেখে নম্র-ভদ্রই মনে হয়। মা এবং মামা-মামীর হাবভাব দেখে মনে হয় পাত্র তাদের পছন্দ হয়েছে। চা নাস্তা খাওয়ার পর ছেলের কাকা মামাকে বললেন - ওরা দুজন একটু আলাদাভাবে কথা বললে আপনাদের আপত্তি নাইতো? ঘরে ঢুকে অপূর্ব প্রথম বললো- বসতে পারি? শিক্ষিত, স্মার্ট মেয়ে কেয়া, ওর মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নেই। ও হেসে বললো- অবশ্যই।

- কেমন আছেন?
- ভালো, আপনি ভালোতো?
- কই ভালো, পাত্রী দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। অভ্যেস নেইতো।
- কোন পাত্রীই বুঝি আপনার পছন্দ হয় না?
- উল্টো বলতে পারেন, আমাকেই যোগ্য মনে হয়নি অনেকের।

- কেয়া একটু অবাক হয়ে বললো- বলেন কি, কেন?
- হ্যাঁ, সত্যি তাই। এনি ওয়ে আপনাকে কিছু কথা বলার আছে আমার। আমার জীবনের কিছু কথা। আমার বয়স যখন সাত বছর তখন আমাকে, আমার বাবাকে ফেলে আমার মা পালিয়ে যায় বাবার এক বন্ধুর সাথে। তারপর মার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। এর তিন বছর পর আমার বাবা আবার বিয়ে করে। ভদ্রমহিলা আমাকে ভালোবাসতে পারেননি, সম্ভবত বাবাকেও না। তবুও তারা সংসার করছে এখনো। আমার বয়স যখন আঠার, তখন থেকেই আমি আলাদা থাকি। আপনাকে ঘটনাটা আগেই জানালাম কারণ দু'এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হওয়ার পর মেয়েপক্ষ যখন বিষয়টি জানতে পারে তখন অসম্মতি জানায়।

কেয়া একটু ভেবে বলে এ ব্যাপারে আমার মনে করার কিছু নেই কারণ বিষয়টা আপনার বাবা-মার, আপনার না, আমার ব্যাপারে কিছু জানতে চান না?

- সবইতো শুনলাম আমার কাকা-কাকীমার প্রশ্নের উত্তরে। আপনি কতদূর লেখাপড়া করেছেন, এখন কি করছেন। ভবিষ্যতে কি করতে চান, আর কি কি গুণ আছে আপনার, সবই জানলাম।

- কেন, আমি প্রেম করেছি কিনা, সেটা জানতে চান না?

- আগে যদি করে থাকেন, আমি মাইণ্ড করি না। আর এখনো যদি কারো সঙ্গে এ্যাফেয়ার থাকে তবে আমার বিশ্বাস আমার সঙ্গে বিয়েতে আপনি রাজী হবেন না। তবে আপনাকে দেখে, আর কথা বলে আমার ভালো লেগেছে। আপনার মতামত এখনি জানতে চাইবো না। পরে জানিয়ে দেবেন। অপূর্ব বাঁচিয়ে দিয়েছিলো ওকে কারণ প্রথম দেখায় একজন ছেলেকে 'আপনাকে ভালো লেগেছে' বলাটা একজন মেয়ের জন্য খুবই বিব্রতকর।

- কয়েকদিনের মধ্যেই ঘরোয়াভাবে এনগেজমেন্ট হয়ে গেলো। মেয়ে দেখতে দেখতেই ছেলের এক মাসের ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তাই সাব্যস্ত হল চার মাস পরে এপ্রিলের শেষের দিকে ছেলে আসবে, তখন বিয়ে হবে, ইস্টারের পর।

দশ দিন আগে কেয়ার সঙ্গে স্কাইপিতে কথা হচ্ছিলো অপূর্ব'র। অপূর্ব বলছিলো- কভিড-১৯ অর্থাৎ করোনা ভাইরাস যেভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে, ভীষণ ভয় হয়। নিউইয়র্ক-এর অবস্থা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। হাসপাতালে চাকরি করি, কাজে না গিয়ে উপায় নেই। কখন যে কি হয়ে যায় জানি না। এখন মনে হয়, ডাক্তার না হলেই বুঝি ভালো হত। কিচ্ছু ভালো লাগে না। মনে হয় সবকিছু ছেড়ে তোমার কাছে চলে যাই। যদি কারো কিছু হয়, যদি আমাদের আর দেখা না হয়!

অপূর্বর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে। নিজের কান্না অনেক কষ্টে সম্বরণ করে কেয়া বলে - বাজে কথা বলোনাতো। দেখে নিও তোমারও কিছু হবে না, আমারও না। ঈশ্বর আমাদের সহায় আছেন। এরপর সবকিছু ঘটে যায় দ্রুত। প্রথম হালকা জ্বর, কাশি, মাথা ব্যথা। তারপর একটু বেশী জ্বর, গলা ব্যথা। এরপর টেস্টে পজিটিভ। ভেতরে ভেতরে ভেঙ্গে পড়লেও অপূর্ব'র সামনে সেটা প্রকাশ করেনি কেয়া। প্রতিটি স্তরেই অপূর্বকে সাহস জুগিয়েছে, মানসিকভাবে দুর্বল হতে দেয়নি ওকে।

কিন্তু এখনতো আর পারেনা কেয়া। কিভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবে? তবে কি অপূর্ব'র কথাই ঠিক হবে, আর কোনদিন দেখা হবে না ওদের, অসম্পূর্ণই থেকে যাবে একটি প্রণয় কাহিনী! এদিকে দুদিন হল অপূর্ব'র বাবাও আর ফোন করেন না। উনার নাম্বারে কল করলেও ধরেন না, অপূর্ব'র নাম্বারও বন্ধ। দুঃশ্চিন্তায় মা-মেয়ে দুজনেরই আহার নিদ্রা বন্ধ। সারা বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পরদিন সকাল সাতটায় কেয়ার ফোন বেজে উঠলো। অপূর্ব'র বাবার নাম্বার। কেয়ার বুকে কে যেন পাথর চেপে রেখেছে। ওর কি হার্ট এ্যাটাক হবে! অনেক কষ্টে কেয়া হ্যাঁলো বলতে পারলো। ওপাশ থেকে অপূর্ব'র বাবা বললেন - কোন খবর ছিলো না, তাই দুদিন তোমাকে ফোন করিনি। আজ সকালে ডাক্তারের সঙ্গে কথা হলো। উনি বললেন, বিপদ কেটে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। অপূর্ব এখন সুস্থতার দিকে ফিরে আসছে।

ফোন রেখে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে কেয়া। মা আৎকে উঠেন- কোন খারাপ খবর? কেয়া মাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে - না মা, অপূর্ব ভালো আছে। চল আলতারের সামনে গিয়ে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই॥ ❑

ছিন্নমূল মানুষ

স্বপন রোজারিও

করোনার জন্য সমস্যাগ্রস্থ ছিন্নমূল
মানুষ যত,
দিনে দিনে কষ্ট তাদের
বেড়ে যাচ্ছে যে তত।
রিক্সাওয়ালা সারাদিনে
একশত টাকা না পায়,
এতে অন্যান্য নাগরিকদের
কি বা আসে যায়?
দিনমজুরের পেটে ভাই,
নেই যে কোন আহার,
ছিন্নমূল মানুষের এখন
শুধুই দুঃখের পাহাড়।
চারিদিকে জনশূণ্য,
তাদের দু:খের নাই শেষ,
উপর তলার মানুষেরা আছে যে ভাই বেশ।
গরীবদের বাঁচাতে সবাই মেলে দিবে হাত,
ভুলে গিয়ে আছে যত হিংসা ও উঁচু জাত।

এইতো ভালবাসা

এ.এ. মাংসাং

ভালবাসা মানে জোনাকির ঝিকিমিকি
ভালবাসা মানে হাজার তারার মিটমিট রঙ্গিন
ভালবাসা মানে ভালোবাসার কবিতা-উপন্যাস
ভালবাসা মানে ছন্দের মেলানো ব্যঞ্জনবর্ণ।
ভালবাসা মানে আবেগের কল্পনা
ভালবাসা মানে দুহৃদয়ের মিলন
ভালবাসা মানে স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা
ভালবাসা মানে অনেক দিনের সাধনা।
ভালবাসা মানে সুবাসিত ফুলের নির্যাস
ভালবাসা মানে সম্পর্কের টান
ভালবাসা মানে বিলিয়ে দেয়া প্রাণ
ভালবাসা মানে পিতা-মাতায় ম্লান।

সাদাকালো জীবন (৩)

মালা রিবেরু (পামার)

সাধারনত আজানা নাম্বার থেকে ফোন আসলে রিসিভ করিনা, কারন ছাত্রীরা ফোন করে এই সমস্যা, ওই সমস্যা বলে মাথা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এই নাম্বার থেকে বারবার ফোন নিশ্চয় খুব জরুরী না হলে কেউ এতোবার ফোন করে না। কল রিসিভ করার সাথে সাথে কল্পনার কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললো, ম্যাডাম আমি আর পড়াশুনা করতে চাইনা। কল্পনার কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো, কারণ ও পড়া-শুনায় খুব ভালো এবং খুবই ভদ্র ভালো। আমি বললাম, তুমি ছুটি শেষ করে আগে হোস্টলে আসো, হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না।

আমি যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করি সেই কল্পনা সেই প্রতিষ্ঠানের শেষ বর্ষের ছাত্রী। মনোবিজ্ঞানের শিক্ষকের পাশাপাশি মিশুক স্বভাব হওয়া কারনে প্রায় সকল ছাত্রীদের সাথে আমার সুসম্পর্ক থাকে। তাই তাদের যেকোন সমস্যা বা ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করে। কল্পনা পড়াশুনার আগ্রহ সাথে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আমার খুব ভালো লাগে। কল্পনা বলে, ম্যাডাম আমি যখন ২য় শ্রেণিতে পড়ি তখন আমার মা মারা যায়, অভাবের সংসারে বাবা, ভাইবোন খুব কষ্ট করে এইচএসসি পাশ করিয়েছে। তাই ডিপ্লোমার পরে আমি আমি আপনার মতো উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করে দেশের মানুষের সেবার পাশাপাশি বাবা ভাইবোনকে আর্থিক সহযোগিতা করতে চাই

গত বৎসর জুলাইয়ে দিকে ইনষ্টিটিউটে এসে, হঠাৎ করে শুনতে পেলাম, কল্পনা বিয়ে করেছে,খবরটা শোনার পরে খুবই খারাপ লগলো, মেয়েটা পড়াশুনায় এত ভালো, ভবিষ্যত এত পরিকল্পনা করে হঠাৎ করে এত বড় সিদ্ধান্ত নিলো, একটু আলাপতো করতে পারতো। আমি ভাবলাম আমার এত ভাবা বা আশা করাটা কি ঠিক, ওর পরিবার নিশ্চয় যা ভালো মনে করেছে ওর ভালোর জন্য করেছে ।

কিছু দিন পরে কল্পনা আমার কাছে এসে বললো,ম্যাডাম আমি বিয়ে করেছি, আপনি হয়তো জানেন, পরিবার একপ্রকার জোর করে বিয়ে দিয়েছে, আমি আমার স্বামীর সাথে আমার পরিকল্পনা শেয়ার করেছি, সে বলেছে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করবে। আমি তার পরিকল্পনা শুনে খুশি হয়ে বললাম ভালো, এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও,

চলার পথে যত বাধা আসুক না কেন সংগ্রাম করে লক্ষ্যে যাওয়ার যুদ্ধ করে যেও, লক্ষ্যভ্রষ্টা হয়োনা।

এরপর কিছুদিন দেখলাম কল্পনা খুব হাসিখুশি, দেখে ভালো লাগলো, যাহোক মা মরা মেয়েটা সুখী হয়েছে। দুই/তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন দেখি রেলিং-এর কাছে দাড়িয়ে কল্পনা কান্না করছে, কারণ জিজ্ঞেস করতে বললো, ম্যাডাম বিয়ের আগে আমার একটা ছেলের সাথে সর্ম্পক ছিলো, আমার খুব ঘনিষ্ট বান্ধবী মনীষা ওকে সব বলে দিয়েছে, আমি ওর কাছে সব স্বীকার করেছি, বলেছি বিয়ের আগে একজনের সাথে আমার সাথে সর্ম্পক ছিলো, কিন্তু বিয়ের পরে তুমিই সব, আমার সাথে ঐ ছেলের কোন যোগযোগ নাই, কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করে না। সারাক্ষণ সন্দেহ করে, ফোন এনগেজড বা একটু দেরীতে ফোন রিসিভ করলে, আমার সব বান্ধবীদের ফোন করে কোথায় আছি, খুব খারাপ ভাষায় গালি দেয়,আমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে যাচ্ছ। আমি কল্পনাকে বলি, এডজাস্ট করার চেষ্টা করো। জীবনটা খুবই ছোট, যতদিন বাচবে তা উপভোগ করো। সবকিছু মাঝে পড়াশুনা থেকে বিচ্যুত হয়োনা।

আগামীকাল ৮মার্চ বিশ্ব নারী দিবস, আজ ক্লাশ নিতে গিয়ে শুনলাম, কল্পনা ক্লাশে নাই,আর বিকালে ফোন, মনটা খারাপ হয়ে গেলো। নারী দিবসের কথাটা মনে পড়াতে মনটা অজানা এক শক্তিতে ভরে গেলো।

ফোন করলাম কল্পনাকে বললাম, কল্পনা আগামীকাল ৮মার্চ বিশ্ব নারী দিবস তুমি অনেক জয়িতাদের গল্প শুনেছো, তুমি অনেক কষ্ট করে, অনেক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আজ তোমার সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে, কিন্তু জীবনে সবচেয়ে বড় ভূলটা করেছো হঠাৎ করে বড় সিদ্ধান্ত নিয়ছো, এবং আমি তোমার বান্ধবীদের কাছ থেকে শুনেছি অনেকবার ঘুমের বড়ি খেয়ে মৃত্যু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। মৃত্যু কোন কিছুর শেষ না, তুমি বাস্তবতার সম্মুখীন হও, তোমার অভিভাবকসহ কথা বলো, সমঝোতা না হলে প্রয়োজনে আলাদা থাকো। কিন্তু পড়াশুনা থেকে বাদ দিলে জীবনে চরম ভুলটা করবে। পড়াশুনা করে নিজে স্বনির্ভর হও, তাহলে নিজেকে যেকোন পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারেব।

এই ঘাটনাটি আমাদের জীবনের অনেকের সাথে ঘটে যাওয়া ঘাটনা, তাই যেকোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা করে নেওয়া উচিত, আবেগে বশীবর্তী হয়ে এমন সিদ্ধান্ত যেন না নেয়, যার জন্য সারাজীবন কষ্ট পেতে হয়॥ ❑

গুরখুনাথ

সাগর কোড়াইয়া

ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একজন হিন্দু গুরখুনাথকে আসতে দেখতাম। স্বাস্থ্য বেশী ভালো নয়। গায়ের রংটা তেল চিটচিটে। গুরখুনাথের অভাব-অনটন যে নিত্য দিনের সঙ্গী সে বয়সেই তা বুঝতে পারতাম।

গুরখুনাথের সংসার যে কোন মতো চলে তা না বললেও বুঝা যেতো।

গুরখুনাথ বাড়িতে বাড়িতে মন্দিরা বাজিয়ে গান গাইতো। শরীরে জড়ানো থাকতো লাল অথবা গেরুয়া রং-এর পোশাক। পায়ে কখনো স্যাণ্ডেল দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গানের কথাগুলো গরু পালনের নানা রকম রীতি-নীতি ও নিষেধাজ্ঞায় ছিলো ভরপুর। গরুর ঘরে কিভাবে প্রবেশ করতে হবে। গরুকে কি খাওয়াতে হবে; গরুর অসুখ হলে কিভাবে চিকিৎসা করা উচিত; এরকম আরো বহু নিয়মাবলীতে ঠাঁসা ছিলো গুরখুনাথের গান। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। সুরটা ছিলো চমৎকার! এখনো পর্যন্ত কানে বাজে। একটানা তিন থেকে চার মিনিট গোয়ালঘরের সামনে বসে গান গাইতো। গানের পরে গুরখুনাথকে গোয়ালঘরের দরজার উপরে সিঁদুরের ফোটা দিতে দেখতাম। তারপর যে যা দিতো; এই যেমন চাল, ডাল, তরীতরকারী ও টাকা-পয়সা নিয়ে চলে যেতো গুরখুনাথ।

যে বাড়িতে গরু পালন করা হতো গুরখুনাথকে শুধু সে বাড়িতেই যেতে দেখতাম। কিন্তু আমাদের বাড়িতে গরু পালন না করা হলেও প্রায়ই গুরখুনাথকে এসে গান গাইতে দেখেছি। মাকে দেখতাম গান গাওয়া শেষ হলে গুরখুনাথকে চাউল দিতে। গুরখুনাথ চলে যাওয়া শুরু করলে আমরাও পিছনে পিছনে যেতাম। কেন জানি না গুরখুনাথের গান শুনতে বেশ লাগতো। একা একা গাইতেও পারতাম বেশ। হয়তোবা অজান্তে গুরখুনাথ হবার ইচ্ছাও জেগে থাকতে পারে। যখন আমাদের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যেতো গুরখুনাথ তখনই ক্ষান্ত দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতাম।

একবার মনে পড়ে; আমরা যারা গুরখুনাথের পিছনে পিছনে যেতাম তাদের গুরখুনাথ বললো, তোমরা কে কে আমার এই গানটি গাইতে পারবে?

কেউ কথা বলছে না দেখে গুরখুনাথ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বাবু তুমি গাইতে পারবে?

নির্দ্বিধায় হ্যাঁ বলে দিলাম।

গুরখুনাথ হাতের মন্দিরাটি আমাকে দিয়ে বললো, ধরো, গাও।

মন্দিরা হাতে নিয়ে তো আর গাইতে পারি না। গান একদিকে আর মন্দিরা আরেক দিকে। কি যে এক অবস্থা! একা গেয়ে অভ্যাস; কিন্তু সকলের সামনে কি যে কঠিন সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। সীতার অগ্নিপরীক্ষার চেয়েও কঠিন যেন।

গাওয়া শেষ হলে পর গুরখুনাথ তার ঝোলা থেকে আমাকে আটআনা পয়সা দিয়ে বললো, এটা দিয়ে বরফ কিনে খেয়ো।

কি যে খুশি হয়েছিলাম। সেই সময় আটআনা দিয়ে দুটো বরফ পাওয়া যেতো। যারা দেখলো গুরখুনাথ আমাকে আটআনা পয়সা দিয়েছে আফসোস করতে লাগলো।

পরবর্তীতে পড়াশুনার তাগিদে বাড়ি ছাড়তে হলো। ছুটিতে যখন বাড়িতে যেতাম প্রায়ই গুরখুনাথের সাথে দেখা হয়। হাসি মুখে কেমন আছি জিজ্ঞাসা করতো। কথা হতো বিস্তর। একবার ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছি। যাওয়ার পরদিন সকালবেলা গুরখুনাথের সাথে দেখা। আমি ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ গুরখুনাথের মন্দিরার টুংটাং শব্দ আমার কানে গেল। বাইরে বেরিয়ে আসি। গুরখুনাথ অধীর হয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে। গান শুনে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে গুরখুনাথের শরীরটা ভালো নেই। বয়স তার আপন গতিতে হামলে পড়েছে গুরখুনাথের উপর। গানের অনেক কথাই স্পষ্ট নয়। কেমন যেন বেঁধে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখি গুরখুনাথের সামনের পাটির কয়েকটি দাঁত নেই।

গুরখুনাথের গান গাওয়া শেষ হলে সামনে এগিয়ে যাই। ফোঁকলা দাঁত বের করে বললো, কবে এসেছেন বাবু?

আসার দিন বলতেই গুরখুনাথ বললো, ভালোই হয়েছে এসেছেন। কালাপরশু আমার মেয়ের বিয়ে। আপনি অবশ্যই আসবেন কিন্তু।

ওর যে মেয়ে আছে জানা ছিলো না কখনো; গুরখুনাথকে তার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করারও সময় হয়নি। গুরখুনাথের আপনি সম্বোধন শুনে কেমন জানি লজ্জা লাগলো আমার। তুমিতেই অভ্যস্ত ছিলাম ছোটবেলায়। সে সময় গুরখুনাথের মেয়ের বিয়েতে আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। তড়িঘড়ি শহরে ফিরে আসতে হয়।

এখন কদাচিৎ যাওয়া হয় বাড়িতে। ইচ্ছা করলেও কাজের চাপে বেশী যাওয়া হয়ে উঠে না। ইচ্ছাগুলোকে গলাটিপে মেরে বিসর্জন দিই। বাড়িতে গেলে এখন আর গুরখুনাথের দেখা পাই না। বয়সের ভাড়ে চলাফেরা করতে পারে না হয়তো। মাকে জিজ্ঞাসা করতে মাও সঠিক উত্তর দিতে পারলো না। কতদিন ধরে আসছে না জিজ্ঞাসা করতে মা জানালো প্রায় সাত আট মাস হবে। আমাদের পাশের বাজারের পশ্চিমদিকে গুরখুনাথের বাড়ি জানি। তবে যাওয়া হয়ে উঠেনি কখনো।

একদিন বিকালবেলা বাজারের এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতেই বাড়ির ঠিকানা বললো। সময় করে গেলাম। গুরখুনাথের ঘর বলতে একটি ছাপড়া ঘর। ঘরের বারান্দায় রান্নাবান্নার কাজ সম্পন্ন হয়। ছোট্ট এক উঠান; তার সামনেই পঁচাডোবা। ভুরভুর করে পানির পচা গন্ধ নাকে এসে লাগে। নাক চেপে ধরে ডাক দিলাম। কেউ বের হয়ে এলো না। দ্বিতীয়বার ডাকতেই বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। লক্ষ্য করে দেখি মাথায় সিঁদুর। মেয়েটিকে দেখে মনে হলো মা দুর্গার আরেকটি রূপ শারদীয় ছাড়াই পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

মেয়েটি 'আসুন আসুন প্রীতম দা' বলে বারান্দায় মাদুর পেতে দিলো।

মেয়েটির মুখে আমার নাম শুনে অবাক হলাম। ও আমার নাম জানলো কি করে! কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। গুরুখুনাথের কথা জিজ্ঞাসা করতেই মেয়েটি ছলছল চোখে বললো, বাবা পরশু দেহত্যাগ করেছেন।

গুরখুনাথের মৃত্যুর কথা শুনে কেন জানি কোন কষ্টবোধ হলো না। বুঝতে পারলাম এ গুরখুনাথের মেয়ে; যার বিয়েতে গুরখুনাথ আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলো।

টুকটাক কথা হলো। শশুড়বাড়ি কবে ফিরে যাচ্ছ; জিজ্ঞাসা করতেই খুব সহজেই বললো, বাবা যৌতুকের সম্পূর্ণ পাওনা দিতে পারেনি বলে শশুড়বাড়িতে আমাকে আর রাখেনি। শুনেছি স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছে। তাই ভাবছি এখানে মায়ের সাথেই থেকে যাবো।

গুরখুনাথের বাড়ি থেকে ফিরে আসছি; পিছন থেকে গুরখুনাথের মেয়ে ডাক দিলো। কাছে এসে ছোট একটি ব্যাগ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, বাবা মৃত্যুর তিনদিন আগে আমার হাতে এই ব্যাগটি দিয়ে বললো যেন আপনাকে দিই। কৌতুহল হলো; ব্যাগের মধ্যে কি থাকতে পারে! বাড়িতে ফেরার পথে ব্যাগটি খুলি।

আমি তো অবাক! চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। ছোটবেলায় গুরখুনাথকে যে মন্দিরা বাজিয়ে গান গাইতে দেখেছি সে মন্দিরাটি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলো। দু'হাতের আঙ্গুলে প্যাঁচিয়ে নিয়ে টুংটাং শব্দে বাজাতে থাকি।

পথে কোন মানুষজন নেই। কিন্তু মনে হলো আমার কানের কাছে কেউ আস্তে করে বললো, বাবু গানটি ধরেন; গাইতে পারবেন॥❑

আঠারোগ্রামের বিয়ে অনুষ্ঠানের কথকতা

মিলটন রোজারিও

রং খেলা হলো হোলি খেলা। হিন্দু সম্প্রদায় এই হোলি খেলাটি তাদের একটি ধর্মীয় উৎসব হিসাবে পালন করে থাকে। হোলি বা রং খেলা কিন্তু শুধু আনন্দ উৎসব করার জন্য নয়। এর একটি অর্থ আছে। আর তা হচ্ছে নতুনকে বরণ করে নেয়া বা নব সূচনা করা। আমার বক্তব্য কিন্তু এই হোলি খেলাকে কেন্দ্র করে নয়। এই হোলি খেলা দেখে আমার সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। আর সেই পুরোনো দিনের কথাটি বলতেই আমার এই লেখাটির অবতারণা।

আঠারোগ্রামে বিয়ে বাড়ীতে এক সময় এই রং খেলার বহুল প্রচলন ছিল। আজ এই প্রজন্ম হয়তো আমার কথাটি শুনে চমকে উঠতে পারে। অন্য এলাকার কথা আমার বিশেষ জানা নাই। যাহোক, এই রং খেলা প্রসঙ্গে বলতে গেলে আরো অনেক পুরোনো দিনের কথা বলতে হবে। যা আমাদের বর্তমার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা শুনলে হয়তো অবাক হবে!

এখন সব এলাকায় মানুষজনকে দেখা যায় বড়দিনটা কোন ভাবে পালন করার পরপরই শুরু করে দেয় বিয়ের আয়োজন করতে। আগেও এমনটি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কারণ এই সময়টি হলো বিয়ের মৌসুম। বড়দিনের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে চাকুরীজীবিরা ছুটি কাটাতে বাড়ীতে আসে। আর তখন বাবা-মা বা অবিভাবকেরা বাড়ীতে বিয়স্তা ছেলেমেয়ে থাকলে বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। ৬০টের দশকে বা তার আগেও ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে পুরো গ্রামের মানুষজনকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর একটি প্রথা ছিল। খাবারের আইটেমে থাকতো ভাত, বোয়াল বা আইড় মাছের ভাজাকারী, কালদোকারী, শুকরের মাংসের কারী, লাউ-তেঁতুলের চুকা, মাংশের হাড় দিয়ে কালাইয়ের ডাল এবং শেষে উতারী। উতারী হলো আঠারোগ্রামের এক ধরনের খির জাতিয় মিস্টান্ন। অতুলনীয় মজাদার খাবার দাবার সব। আর এই সব খাবার খেতে হতো মাটির বাসনে এবং পানি খেতে হতো দুনায়। টেবিল চেয়ারে বসে খাবারের কোন বালাই ছিল না সেই সময়। নল-খাগড়ার তৈরী ধারী ছিল বসার সর্বোত্তম আসন। আর এই ধারী বাজার থেকে ভাড়ায় পাওয়া যেতো। যত বড় লোকেই হোক না কেন সবাইকে এই ভাবে বিয়ে-সাদির আয়োজন করতে হতো। এই ছিল তখনকার বিয়ে বাড়ীর রীতিনীতি। গ্রামের মাতৃবর প্রধানরাই বিয়ে বাড়ীর সব আয়োজনের দায়িত্বে থাকতেন। বিয়ে বাড়ীর মাছ, মাংস, সবজি গ্রামের মাতৃবররাই কেটে-কুটে দিতেন এবং রান্নার দায়িত্বে থাকতেন গ্রামেরই সব সেরা রাধুনীরা। ঠিক সময় মত প্রায় দেড় থেকে দুই শত জন মানুষের রান্না এবং খাবার-দাবার শেষ করা হতো। খাবারের পর বরের বাড়ীর উঠানে বসতো আবার তামসার আসর। এলাকার সেরা বাজনা বাদকের দল ছিলো দশরথের। আর দ্বিতীয় দল ছিল আড়িনার দল। এরাই তামসা করতো।

তামসায় বিভিন্ন রকমের নাচ, গান এবং রঙ্গ-ঢঙ্গ করে মানুষকে নির্মল আনন্দ দেবার প্রচেষ্টা থাকতো বাজনা দলের। দশরথের সানাই আর অনিলের সেই আনারকলি সাজের নাচ ছিল এলাকায় খুবই জনপ্রিয়। সাথে ছিল বিশিষ্ট কৌতুকাভিনেতা শ্যামা দাসের (ব্যাঙ্গা) অঙ্গ-ভঙ্গী। যা দেখে মানুষ ভীষণ হাসির খোরাক পেতো। এ ছাড়াও ডালা এবং ধুয়ানী বাড়ীতে বান্দুরা বাজারের সন্তোষের মাইক ছিল অবধারিত। সেটা কনে এবং বর দুই বাড়ীতেই মাইক বাজিয়ে বিয়ের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলা হতো। যা শুনে এলাকার মানুষজন বুঝতে পারতো ঐ বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে। এখনকার মত সাউন্ড সিস্টেমে ফুল ভলিউমে মানুষের কান ঝালাপালা করা ছিল না তখনকার মাইক। মান্না দে, লতা মুঙ্গেশকার, সন্ধ্যা মুখার্জি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র এদের গানই মাইকে শুনতে পছন্দ করতো সবাই।

যাহোক, আঠারোগ্রামে তখনকার সময়ে ডালা এবং বিয়ে সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে হয়। প্রথমে আসি ডালা প্রসঙ্গে। বিয়ের আগে কনে দেখা পাকাপাকি করতে আয়োজন করা হয় ডালার। এই ডালায় নেয়া হতো একমনের মত মিষ্টি। যেমন রসগোল্লা, আমের্তি, পিতলের দুই কলসী ভরে ২০/২৫ সের দুধ, বড় এক ঝাকা ভর্তি টোষ্ট বিস্কেট এবং খঞ্চায় ভরে চাপাতা, খেঁজুরের গুড় (শুকনো মিটি), পান, সুপারী, জর্দা, খয়ের ইত্যাদি। বরের নিকট আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও গ্রামের সব পুরুষ মানুষ, মেয়ের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন এবং গ্রামের সব পুরুষরা ডালার সময় মেয়ের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হতো। কোন কোন বাড়ীতে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিতও উপস্থিত থাকতেন বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে। এ ছাড়াও উভয় পক্ষের মাতৃবর প্রধানের উপস্থিতিতে বিয়ের কথা পাকাপাকি করা হতো।

দ্বিতীয় হলো ধুয়ানী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্তোষের মাইক এবং বিকেল থেকে বিয়ের বাদ্যি-বাজনা বরের বাড়ীতে এসে হাজির হতো। তারপর চলতো নিকট আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী থেকে ডালা নিয়ে আসার পালা। এই ডালায় থাকতো কলসী ভর্তি দুধ, খঞ্চা ভর্তি খেঁজুরের গুড় এবং পান-সুপারী। সেই সময় এলাকায় বিদ্যুতের কোন ব্যাবস্থা ছিল না। তাই সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে হেজাগ বাতি ছিল বিয়ে বাড়ীর প্রধান সম্বল। সন্ধ্যায় হেজাগ বাতি নিয়ে বাজনা বাজিয়ে বরের বৌদিরা, বোনেরা এবং অন্য মহিলারা নদীর ঘাট থেকে কলসীতে ভরে পানি এনে বরকে ধুয়াতো। আর কনের বাড়ীতেও ঠিক তেমনি করা হতো।

৮০-র দশক থেকে আঠারোগ্রামে বিয়ে সাদির রীতিনীতিতে একটু পরিবর্তন আসতে শুরু করে। আসে নতুনত্ব, আসে চমক, খাদ্যের সেই পুরোনো ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে আসে পোলাও, বিরিয়ানী, মুরগীর রোষ্ট, রেজালা, মাছের হালকা ঝোলকারী, সালাদ ইত্যাদি। বরকে এবং কনেকে দেয়া হয় গায়ে হলুদ। নাম করন করা হয় হলুদ সন্ধ্যা, হলুদ ছোঁয়া ইত্যাদি। মেয়েরা পড়তে শুরু করে একই রঙের (হলুদ/লাল) শাড়ী, ছেলেরা সাদা, মেরুন, হলুদ পাঞ্জাবী। এই রীতিনীতি এখনও চলছে।

সে যাহোক, বলছিলাম সেই পুরোনো দিনের কথা। আগে বরের বাড়ীতে বা কনের বাড়ীতে গায়ে হলুদ দিতে যেতো না। ছেলের বাড়ীতে ছেলের বৌদি এবং মেয়ের বাড়ীতে মেয়ের বৌদিরা এই ধোয়ানীর কাজ সম্পন্ন করতো। সন্ধ্যায় ছেলের জামাইবাবু অথবা একজন মুরুব্বি সাথে দশ/পনেরোজন পুরুষ ও মহিলাসহ একদল বাজনা নিয়ে কনের

বাড়ীতে যেতো কনের জন্যে বিয়ের গয়না দিতে। এখানে গয়নার সাথেও থাকতো ১০/১২ সের মিষ্টি, দুধ, পান সুপারী। ভোরে কনে সাজাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলের বাড়ীতে গ্রামের ছেলেরা করতো ধুয়ানী রাত। গান বাজনার সাথে বাংলা মদ, ভাজাকারী, মুড়ি ধুয়ানীর আনন্দটা আরো বাড়িয়ে দিতো। সে আনন্দ আজ আর দেখা যায় না, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম আর ব্যান্ডের জোয়ারে।

গয়না দিতে যাওয়া নিয়ে আমার জানা এবং দেখা একটি ঘটনার কথা না বলে পারছি না। আমার ছোট কাকার বিয়েতে এমনি গয়না দিতে গেল প্রায় ১৫/১৬ জন লোক নিয়ে আমার পিতাশ্রী। কনের বাড়ী অর্থাৎ আমার কাকীর বাড়ী নতুন তুইতাল। রাত আটটায় দু'টি হেজাগ বাতি নিয়ে শৈল্লার বটগাছের পাশে দিয়ে ধু-ধু চকের মাঝ খান দিয়ে চলে গেলেন তারা গয়না দিতে। আর তাদের ফিরে আসার কথা রাত সারে দশটার মধ্যে। রাত এগারোটা বেজে গেলেও তাদের ফিরে আসার কোন খবর নেই। বাড়ীর মুরুব্বিরা সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবলো আমার পিতাশ্রী যখন আছেন তাদের সাথে, তা'হলে তাদের তো কোন সমস্যা হবার কথা নয়। এদিকে ভোর হয়ে আসছে কনে সাজাতে যেতে হবে। ঠিক তাই হলো, আর একদল পুরুষ ও মহিলা ভোর হওয়ার সাথে সাথে কনে সাজাতে নতুন তুইতালের উদ্দেশ্যে সেই পথেই রওনা হয়ে গেল। কারণ, সময় মত গির্জায় পৌছাতে হবে। নতুবা ফাদার ভীষণ রাগ করবেন। ঐদিকে কনের বাড়ীর লোকজন অপেক্ষায় আছে কখন বরের বাড়ীর মানুষজন গয়না নিয়ে আসবে। ভোর হয় হয়। কনে বাড়ীর লোকজন দুরে বাজনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে অথচ বাজনা তাদের কাছে আসছে না! আমার পিতাশ্রীসহ ১৫/১৬ জন লোক নিয়ে সারা রাত শৈল্লার চক হয়ে সেই বালুখন্ডর রাস্তা পর্যন্ত ঘুড়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু ঐ রাত্রে তারা আর নতুন তুইতাল কনের বাড়ী খুঁজে পায় নাই। ভোরের দিকে তারা শেষ পর্যন্ত কনে বাড়ীতে গিয়ে পৌছে ছিল। আর তাদের খানেকক্ষণ পরপরই কনে সাজাতে গিয়েছিল যারা তারা কনে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ছিল। পরে সবাই বলাবলি করছিল যে, যারা গয়না দিতে এসেছিল তাদের কানাউলায় ধরে ছিল, এবং সারা রাত তাদের শৈল্লার চক আর বালুখন্ডের চকে ঘুড়িয়েছে। ভাগ্য ভালো যে, রাত্রে তাদের কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে নাই বা ডাকাতও ধরে নাই। এটাই ঈশ্বরের কাছে তাদের ধন্যবাদের বিষয়। এমনি ঘটনা আঠারোগ্রাম এলাকায় আরো বহু বিয়ে বাড়ীতে ঘটেছে।

যাহোক, খুব ভোরে কনে সাজাতে যেতে হতো। বরের বাড়ী দরুন হাসনাবাদ, আর কনের বাড়ী তুইতাল, এই তিন, সারে তিন কিলো মিটার দুরের পথ ধানি জমির সরু আইলের পথ পায়ে হেঁটেই যেতে হতো কনে সাজাতে। এখনকার মত এতো সুন্দর রাস্তা বা যান বাহনের সুযোগ-সুবিধা তখন ছিল না। তবে হ্যাঁ যাদের একটু অর্থ-বিত্ত সামর্থ্য ছিল তারা অনেকে পাল্কীর ব্যবস্থা করতো। অনেকে বরের জন্যে ঘোড়ার ব্যবস্থাও করতো। যারা বরের সাথে চলনে যেতো তাদের জন্যেও ঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল। এমনকি বর যাত্রী দুরের হলে ফিরানী আনতে কনে বাড়ী থেকে ঘোড়া পাঠানো হতো বরকে আনার জন্য, এবং কনের জন্যে পাল্কী। বর্ষার সময় কোন বাড়ীতে বিয়ে হলে, বিরাট গয়নার নৌকা ভাড়া করা হতো। গয়নার নৌকা হলো এক ধরনের বিরাট নৌকা। যে নৌকা বান্দুরা বাজারের সমস্ত পাইকারী ব্যবসায়ীরা ঢাকা থেকে বাজারের মালামাল আনা নেয়া করতো। এই গয়নার নৌকায় চরে এক সময় আঠারোগ্রাম এলাকার মানুষজন ঢাকা আসা যাওয়াও করতো।

বিয়ের পর গির্জা থেকে চলন বের করা হতো। এই চলনের একটি নিয়ম ছিলো, ছেলের বাড়ীর খুব নিকট আত্মীয় যারা তারা যদি চাইতো তবে বিয়ের চলন তারা তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতো। আত্মীয় বাড়ীতে চলন এলে ঘরের সামনে বড় একটি পিঁড়ির উপর বর-কনেকে দাঁড় করিয়ে ঐ বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনরা তাদেরকে আর্শীবাদ করতো। তারপর বর-কনেকে ঘরে নিয়ে যেতো। ঘরে গিয়ে দুধের শরবত বা লেবুর শরবত, মিষ্টি খাওয়ানো হতো। আর চলনের সব মানুষকে খেঁজুরের গুড়ের চা, মুড়ি এবং টোষ্ট বিস্কেট খাওয়ানো হতো। এমনি ভাবে দুই/তিন বাড়ীতে চলন যেতো। আর সব বাড়ীতেই এই একই পদ্ধতীতে নতুন বর-কনেকে সহ সবাইকে খাতির আপ্যায়ন করা হতো।

এই চলন চলা কালে আরো একটি বিশেষ বিষয় ছিল আনন্দ পত্র বিতরণ। বিভিন্ন রঙ্গের ছোট কাগজে খুব সুন্দর সুন্দর ঘটনা নিয়ে লেখা হতো সেই আনন্দ পত্র। যেমন, কনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে লেখা হতো বরকে নিয়ে, ওমুক বাড়ীতে অমুক গ্রামের বিখ্যাত ডাকাত ওমুকের মেয়েকে আজ ডাকাতি করে নিয়ে আসবে। বিয়ে বাড়ীতে মুরগী চোর ধরা পরেছে ইত্যাদি।

চলনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ঝাল্ট নাচ। গ্রামের ছেলেরা বিয়ের মাস খানেক আগে থেকেই বরের ঘর-বাড়ী সাজানোর কাজ শুরু করে দিতো। তিন হাত সাইজ বাঁশের কঞ্চি আর ঘুড়ি বানাতে রঙ্গিন কাগজ দিয়ে ফুল পাতা বানিয়ে গাছের মত ঝাল্ট সাজিয়ে রাখতো। দশ/বারো জন ছেলে এই ঝাল্ট নিয়ে বাজনার তালে-তালে নেচে-নেচে চলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতো। ছেলেরা বরের বাড়ী-ঘরও রঙ্গিন কাগজ কেটে তাতে 'শুভ-বিবাহ' কথাটি লিখে সুন্দর করে সাজাতো। বাড়ীর উঠানের মাঝখানে আসর সাজানো হতো। ঘরের সামনে এবং বাড়ীর প্রধান গেইটে কলা গাছ দিয়ে তোড়ন সাজানো হতো। তাতে দেবদারু ডাল আর রঙ্গিন কাগজ দিয়ে সুন্দর করে লেখা হতো "শুভ-বিবাহ"। সেই সময়ের নিয়মানুযায়ী বিয়ের দিন বর আর নব বধুকে ঐ রাতে এক সাথে থাকতে দিতো না। কারণ, ঐ রাতটিকে বলা হতো 'কাল-রাত্রি'। আর এই কাল-রাত্রিতে কনের সাথে তার নানী বা দাদী গয়রা হিসাবে আসতো এবং নতুন বর আর কনের সাথে ঐ রাতে বরের মাসহ সবাই এক ঘরে ঘুমাতো।

বিয়ের পরের দিন হলো রং খেলার দিন। ঐ দিন সকালে ছেলের বনাই অর্থাৎ জামাইবাবুকে অথবা বড় বৌদিকে উপলক্ষ্য করে সব শালা-শালিরা বা ননদ-দেবররা নতুন বৌকে নিয়ে রং খেলায় মেতে ওঠতো। আর এটি শুরু হতো যখন কনের বাড়ীর লোকজন বরকে ফিরানীতে নিতে আসতো ঠিক সেই মুহূর্তে। এতে বর পক্ষের ভালো খরচও করতে হতো। যেমন গয়রা বুড়িকে নতুন কাপড় পড়ানো আর কনে বাড়ীর যারা ফিরানী নিতে এসেছে সেই সব মেয়েদের ইচ্ছে মত চুড়ি পড়ানো হতো সেই দিন। রং খেলার পর বরকে তার বন্ধু-বান্ধব সহ আত্মীয়দের বাজনা বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো মেয়ের বাড়ীতে ফিরানীতে। মেয়ের বাড়ীতে গেলে প্রথমে মেয়ের ছোট ভাইবোনেরা এবং বৌদিরা বরকে বিশেষ সম্মানী না দিলে বাড়ীর গেইটে আটকে রাখতো। কাজেই তখনও বরকে বেশ মোটা অংকের সেলামী দিয়ে কনের বাড়ীতে ঢুকতে হতো।

কনের বাড়ী ফিরানীতে বর এবং তার সাথে যারা এসেছে তাদেরকে বলা হয় গয়রা। এই গয়রাদেরকে বিশেষ সম্মানের সাথে খাতির করতে হতো। এদের খাবার মেনু ও থাকতো খুব উন্নত মানের। কথায় বলে 'জামাই আদর'। বরের সম্মানে নাস্তায় থাকতো, দই, খই, চিড়া, মোয়া আর নানা রকমের পিঠা এবং দুধ ও চা। দুপুরে খাবারের আগে বরকে আরো একবার তার নতুন শালীদের এবং বৌদিদের পাল্লায় পড়তে হতো। এই পাল্লাটি হলো হাত ধোয়া নিয়ে। তাদের সাথে একই থালায় বসে খাওয়া-দাওয়া করা নিয়ে। হাত ধোয়াতেও শালীদের ও বৌদিদের বেশ মোটা অংকের হাত খরচা দিতে হয় বরকে। নতুবা তারা নতুন জামাইবাবুর হাত ধোবেই না। হাত ধোয়ার পর বর যখন খেতে যাবে ঠিক তখন সেই শালীরা আসবে তার সাথে বসে একই থালায় খেতে। বিরাট একটি কাঁসার থালার চারপাশে বসে আরবী কায়দায় তারা খাওয়া শুরু করে। নতুন জামাইবাবু যেই কোন মাংসের টুকরায় হাত বাড়াবে ওমনি চিলের মত ছোঁ মেরে শালীরা সেটা নিয়ে খেতে শুরু করবে। একজন হয় তো মাংসের নাম করে একটি মাংসের হাড় জামাইবাবুর মুখে তুলে দিয়ে হাসিতে গড়িয়ে পড়লো। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ নতুন জামাইবাবুর সাথে তারা খাবার নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে এক সময় উঠে চলে যায়। তখন বেচারা বর একটু শান্তিতে খেতে পারে। দুপুরের খাবার মেনু হলো, প্রথমে রুটির পিঠা আর মুরগীরকারী। তারপর ভাত বিভিন্ন রকমের শাক, ভাজি, বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, মাছের চুকা, মাছেরকারী, শুকরের মাংসেরকারী এবং শেষে খির বা মিষ্টান্ন। রাত্রের খাবারে থাকতো, মাছ ভাজা, মাছেরকারী, মুরগীরকারী, শুকরের মাংসের বিন্দালু আর মুড়িঘন্ট। এই ভাবে কনে বাড়ীতে বরকে দু'দিন আপ্যায়ন করা হতো।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় কনেকে বিদায় দেবার পালা। এই সময় বরের অভিভাবকরা, কনের অভিভাবকরা, দুই পক্ষের গ্রামের মাতব্বরগন উপস্থিত থাকতেন। সবার উপস্থিতিতে কনের আত্মীয়-স্বজনরা বর এবং কনেকে বিবাহের উপহার সামগ্রী প্রদান করতো। নিকট আত্মীয়রা সোনার অলঙ্কার এবং অন্য আত্মীয়-স্বজনরা বেশীর ভাগ উপহার হিসাবে দিতো পিতলের কলসী, থালা, গ্লাস/চামচ ইত্যাদি। বরের সাথে যারা গয়রা এসেছিল তাদের সম্মানে খুশী হয়ে দিতো খই, চিরার মোয়ার রাইং এবং একশত এক টাকা মাত্র।

এখানেই শেষ নয় কিন্তু। বিয়ের পর বর এবং কনে বাড়ীতে আরো কিছু অনুষ্ঠানাদি চলে। যেমন ফিরা ভাত এবং কাপড় পড়ানো। ফিরা ভাত হয় কনের বাড়ীতে। দুইদিন ফিরানী খেয়ে বর তার নব বধুকে তো তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। ঐ রাত হলো তাদের জন্য বাসর রাত। পরদিন সকালে কনে বাড়ীর তিনচারজন লোক যেমন কনের বৌদি, বোন, বান্ধবী এবং সাথে একজন মুরুব্বি মিষ্টি নিয়ে আসবে বর আর কনেকে কনের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। এদিনও বরকে বিভিন্ন রকমের পিঠা খাওয়ানো হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাটিসাপটা পিঠা। এই দিন বরের সামনে একশো একটা পাটিসাপটা পিঠা খেতে দেয়া হয়। দুপুরে বরের বাবা-মা এবং খুব ঘনিষ্ট কয়জন আত্মীয়-স্বজন আসে কনে বাড়ীতে নিজেদের মধ্যে আত্মীয় চেনা/জানা পরিচয় করতে।

কাপড় পড়ানো অনুষ্ঠানটি হয় বরের বাড়ীতে একদিন বা দু'দিন পর। ঐদিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয় নতুন বৌ বরের বাড়ীতে এসে প্রথম মাছ কাটা। বাজার থেকে ইয়া বড় একটা রুই মাছ আনা হয় নতুন বৌ কাটবে বলে। বাড়ীর বৌদিরা মাছ কাটতে তখন নতুন বৌকে সাহায্য করে থাকে। দুপুরে নতুন জামাই বাড়ীতে আসে কনের বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা। তাদেরকে বেশ খাতির যত্ন করে বসিয়ে হালকা নাস্তা করার পর শুরু করা হয় নতুন কাপড় পড়ানো অনুষ্ঠান। পুরুষরা বাদে কনে বাড়ীতে থেকে যারা আসবে সবাইকে নতুন শাড়ী পড়ানো হতো। সেই সাথে চলতো চুড়ি পড়ানো। বরের বাড়ীর মুরুব্বিরা যেমন বরের মা, দাদী, নানী, চাচী, মামী, মাসি-পিশিরা এরাও নতুন শাড়ীর ভাগ পেতেন।

এই ভাবেই সেই সময় আঠারোগ্রামে বিয়ে সাদির অনুষ্ঠানাদি হতো। যা আজকের প্রজন্মের কাছে হয়তো গল্প মনে হবে॥ ❑

জীবন তরী

স্পর্শ মার্ক পালমা

জীবন তরী রয়ে যায়
সেই তরী, শুধু ছুটে যায়,
শান্ত জলের উপরই বয়ে যায়।
যেদিকে মোড় ঘুরাই সেদিকেই
শুধু চলে যায়
মানে না কোনো ঝড়,
বাধা-বিঘ্ন ভয়।
তবুও চলে সেই তরী,
যতক্ষণ না হাল ছাড়ি।

তরীর পাল বাতাসে বয় যেদিকে,
তরীও ঠিক ছুটে পালায় সেদিকে।
বুঝে না কোনো অবুঝ কারণ,
মানে না কারো বারণ।

তরীটি যে সময় ও স্রোতের মতই বহমান
মানে না কোনো বাধা-বিপদ
সর্বদাই বেগমান
তাই সেই তরীই চলমান
জীবনের লক্ষ্য অর্জনে।

স্বপ্নতূরি

যোষেফ হাজরা

শোন শোন হে ইস্রায়েল সন্তান
শোন, ওই যে আকাশে বাজে স্বপ্নতূরি।
তার আহ্বানে দাও হে সাড়া, দাও সাড়া
দূতেরা মহোৎসবে বাজায় তূরি-তূর্য নিদান

সমস্ত বিশ্বমণ্ডল কেঁপে কেঁপে ওঠে আজ
পাপ অহংকারের বিশাল প্রাসাদ ভাঙ্গুক,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক যত দুরাচার।

অমিয় বাণীতে জ্বলুক চারিধার
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-সহানুভূতি
ছড়িয়ে যাক
এক পবিত্র পরমাণুর বিস্ফোরণের মতো।

সকল মানুষ এক হয়ে থাক,
এক কণ্ঠে তারা গেয়ে উঠুক
শান্তির নব গান।

ধর্মক্লাসে পর্ব দিবস আলোচনা

মাস্টার সুবল

একদিন ধর্মক্লাস নিচ্ছিলাম। ক্লাসে যিশুর জন্ম দিবস পর্ব আর যিশুর পুনরুত্থান দিবস পর্বের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় পর্ব দিবস তা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। আমি ক্লাসে ছাত্রদের দুই দলে ভাগ করলাম। প্রথম দলে রাখলাম যারা যিশুর জন্ম দিবস বড় পর্ব দিবস মনে করে, আর দ্বিতীয় দলে রাখলাম, যারা যিশুর পুনরুত্থান দিবস বড় পর্ব দিবস মনে করে।

এবার আমি প্রথম দলকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা বল, যিশুর জন্ম দিবস কেন বড় পর্ব দিবস? এ বিষয়ে ছাত্ররা অনেকে অনেক কথা বলল, আবার অনেক প্রমাণও দেখালো। শেষে তারা বলল, যিশুর জন্ম না হলে খ্রিস্ট ধর্মই থাকত না। এবার আমি দ্বিতীয় দলকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা বল, যিশুর পুনরুত্থান দিবস কেন বড় পর্ব দিবস? তারাও অনেকে অনেক কথা বলল, আবার অনেক প্রমাণও দেখালো। শেষে তারাও বলল, যিশু পুনরুত্থান না করলে কেউই খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাস করত না।

ছাত্রদের কথা শেষে আমি তাদের বললাম, তাহলে এবার শোন আমার কথা। আমি পবিত্র বাইবেল পাঠে যা জানি, যা বুঝি আর যা বিশ্বাস করি তা বলি। পবিত্র বাইবেলে আছে, এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি। যথা: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ইশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। এই তিনে মিলে সমানে সমান ঈশ্বর। আমরা পরিবারের সবাই মিলে সমানে সমান পরিবার। আমাদের মৃত্যুর পর সমস্ত স্বর্গীয় আত্মা হবে সমানে সমান স্বর্গীয় আত্মা।

শেষে ছাত্রদের বললাম, যিশুর জন্ম, যিশুর মৃত্যু ও যিশুর পুনরুত্থান এ তিনে মিলে সমানে সমান যিশু। যিশুর জন্ম দিবস, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব দিবস আর পুনরুত্থান দিবস এ তিনে মিলে সমান সমান পর্ব দিবস। তবে আমরা যদি এ বিষয়ে একজন ফাদারকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে হয়তো আরো অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারবো, বুঝলে? ❑

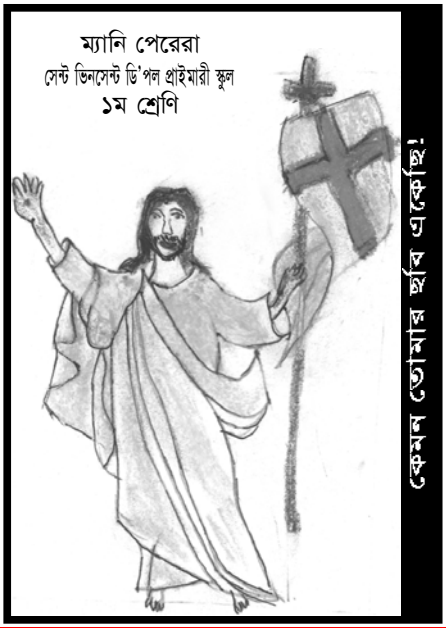

ইস্টার সানডে

আন্তনী বর্ণ ক্রুশ
(তৃতীয় শ্রেণি)

সানডে মানে বিশ্রামবার
সবাই করবে যিশুর নামে শ্লোগান,
যিশুর আজ পুনরুত্থান
করব সবাই মিলে সুখের গান।
স্বর্গে আরোহন করলেন যিশু
আনন্দে মাতোয়ারা সকল শিশু,
আমাদের জন্যে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন
কবর থেকে তিনি স্বর্গে গেলেন।

ত্রাণকর্তা

উইলিয়াম রনি গমেজ

আমরাই তোমাকে ক্রুশে দিয়েছি
তোমাকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছি।
অথচ তুমি আমাদের ভালবেসে
আমাদের মুক্তি দিতে, এই পৃথিবীতে
এসেছিলে।।
আমরা তোমাকে অপমান করেছি
বিদ্রুপ করেছি, থু-তু দিয়েছি মুখের উপর...
কাঁটার মুকুট পরিয়েছি তোমার মাথায়।
তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছি ভারী এক ক্রুশ
এ যেন ক্রুশ নয়, আমাদের পাপ
আমাদের সমস্ত অপরাধ :
তুমি নীরবেই একা বয়ে চললে
চলতে-চলতে মাটিতে পড়ে গেলে
একবার, দুইবার, তিনবার!
ক্ষত-বিক্ষত হলে; তীব্র যন্ত্রণায়
ছট্‌ফট্ করলে অবিরত
অবশেষে পিতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলে...
তুবও তুমি আমাদের ক্ষমা করে দিলে
দু'হাত বাড়িয়ে দিলে বুকে জড়িয়ে ধরার
জন্য
এবারো কি তুমি হাত বাড়িয়ে দিবে না
বিশ্ব মহামারীতে আজ
বিশ্বের সকল মানুষ, কিংকর্তব্য বিমূঢ়
কোথায় যাবে, কি করবে জানে না
তবুও নিশ্চিত জানি তুমিই পারো মুক্তি দিতে
তুমি যে ত্রাণকর্তা॥

প্রবাসী বিচিন্তা
যেরোম ডি'কস্তা

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার কতিপয় শিক্ষা-১

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীর একটি মাইলফলক। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মোট চারটি দীর্ঘ অধিবেশনে অনুষ্ঠিত এ মহাসভায় পৃথিবীর প্রায় ৩০০০ বিশপ, কার্ডিনাল, বিভিন্ন ধর্মসংঘের প্রধান, ঐশতত্ত্ববিদ, ব্রতধারী নারী ও পুরুষ এবং স্বল্প সংখ্যক ভক্তসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন।

এ মহাসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল কাথলিক মণ্ডলী যেন বিভিন্ন নিয়মকানুন এবং বিধিনিষেধের বেড়াজাল ও শ্বাসরুদ্ধকর বদ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে সুবাতাসপূর্ণ মুক্ত অবস্থানে পৌঁছে। এর অর্থ হচ্ছে, সবকিছু পুরানো ও ঐতিহ্যগত বিষয়াদিকে এত আঁকড়ে ধরে না থেকে কাথলিক মণ্ডলী যেন আধুনিক জগতের পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

মহাসভায় আলোচিত ও সিদ্ধান্তকৃত বিষয়াদির উপর মোট ১৬টি দলিল বা 'ডকুমেন্ট' প্রকাশিত হয়। এসব দলিলের মধ্যে চারটি হচ্ছে 'সংবিধান' (পুণ্য উপাসনা, খ্রিস্টমণ্ডলী, ঐশপ্রত্যাদেশ, ও বর্তমান জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক), ন'টি 'নির্দেশনামা' (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কাথলিক প্রাচ্যমণ্ডলী, খ্রীষ্টীয় ঐক্য-প্রচেষ্টা, বিশপদের পালকীয় কার্যাবলী, সন্ন্যাসজীবন, যাজকীয় গঠন, ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ, মণ্ডলীর প্রেরণকার্য, ও যাজকদের সেবাকাজ ও জীবন, এবং তিনটি 'ঘোষণাপত্র' (খ্রীষ্টীয় শিক্ষা, অখ্রীষ্টান ধর্মগুলোর সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)।

চার বছরে (১৯৬২-১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) অনুষ্ঠিত সভায় পোপ ২৩শ যোহন (জন) শুধু ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের উদ্বোধনী সেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নবনির্বাচিত পোপ ৬ষ্ঠ পল ১৯৬৩, ১৯৬৪, ও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের সেশনগুলো পরিচালনা করেন। এ মহাসভা কাথলিক মণ্ডলীতে যেসব পরিবর্তন এনেছে তার কতগুলো নিম্নরূপ:

১। জগতের প্রতি উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ: পূর্বে কাথলিক মণ্ডলী নিজেকেই শুধু পবিত্র ও ঈশ্বরের কাছাকাছি ভাবতো। অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলী, অন্যান্য ধর্ম, ও জগতের প্রায় সবকিছুকে মন্দ, অপবিত্র, ও যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য ভাবা হতো। এ মহাসভা এ পৃথিবীর সবকিছুকেই ঈশ্বর-প্রদত্ত বলে গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করে। এর পূর্বে দেখা গেছে, কাথলিক মণ্ডলী তার সভ্য-সভ্যাদেরকে অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলীর (প্রটেস্টান্ট-এ্যাংলিকান-অর্থডক্স) এবং অন্যান্য ধর্মের লেকেদের সঙ্গে মেলামেশাকে খুবই খারাপের চোখে দেখতো। তাছাড়া মন্দতা এড়ানোর জন্যও কাথলিকদের দ্বারা রাজনীতি ও ব্যবসা করাকে বিশেষভাবে নিরুৎসাহিত করা হতো।

২। উপাসনা: কাথলিক মণ্ডলীতে প্রথম কয়েক শতাব্দী যাবৎ সিরিয়াক, কপ্টিক, আর্মেনিয়ান, ও গ্রীক ভাষায় খ্রিস্টযাগ ও অন্যান্য উপাসনা পরিচালিত হতো। খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে ল্যাটিন ভাষায় এগুলো পরিচালিত হতে থাকে, যা দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ভক্তসাধারণ কোন কিছু না বুঝেই কিছু প্রার্থনা ও গানে অংশ নিতেন। এ ধরনের খ্রিস্টযাগ ও উপাসনাদিতে তাদের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা এসব উপাসনা যার যার নিজস্ব মাতৃভাষায় পরিচালনার অনুমোদন দিয়ে ভক্তসাধারণকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করেছে।

তাছাড়া খ্রিস্টযাগে শান্তি-চুম্বন (কিস্ অব পীস') চালু করেও ভক্তসাধারণকে পরস্পরের প্রতি উন্মুক্ত হতে উৎসাহিত করেছে। তাছাড়া পবিত্র কম্যুনিয়ন, শুধু রুটিকার বদলে সম্ভব হলে, পবিত্র দ্রাক্ষারসের সঙ্গে প্রদানকেও অনুমোদন করে।

পূর্বে যাজক জনগণের দিকে পেছন ফিরে পবিত্র বেদীর দিকে মুখ করে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। এ মহাসভা জনগণের দিকে মুখ দেখিয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করাকে উৎসাহিত করে। ফলে ভক্তসাধারণ যাজককে এখন খুবই কাছের ব্যক্তি বলে ভাবতে পারেন এবং তারা সক্রিয়ভাবে উপসানাদিতে অংশ নিতে পারেন।

৩। ঐশজনগণকে স্বীকৃতিদান: এ মহাসভা শিক্ষা দেয়, দীক্ষাস্নান সংস্কার (বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত) দ্বারা প্রত্যেক কাথলিক এ মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হয়ে উঠেন। তখন তারা 'ঐশজনগণে' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের জনগণে' পরিণত হন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যিশুর কথানুযায়ী তারা খ্রিস্টদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হন। এ প্রথমবারের মত 'কাথলিক মণ্ডলী' বলতে পৃথিবীর সব কাথলিককে (পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ, যাজক, ব্রতধারী ব্রাদার-সিষ্টার, ও ভক্তসাধারণকে) বুঝানো হয়। এর পূর্বে যাজক শ্রেণীর সদস্যগণই (যাজক-বিশপ-কার্ডিনাল-পোপ) ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তাদের প্রাধান্য ছিল সর্বত্র।

এ মহাসভার শিক্ষানুযায়ী, কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হিসেবে সবাই সমান - কেউ উঁচু বা নীচু নন। এ মহাসভা বলে, পবিত্র ও অপবিত্র (পাপী) এ দু-ধরনের মানুষই কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা। এদের মধ্যে লিঙ্গগত, শ্রেণীগত, শিক্ষাগত, সামাজিক মর্যাদাগত, জাতি-উপজাতিগত এবং সংস্কৃতিগত কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তসাধারণকে ধর্মীয় ও আত্মিক সেবাদানের জন্যই ঈশ্বর যাজকশ্রেণী সৃষ্টি করেছেন, যাজকশ্রেণীকে সেবাদানের জন্য ভক্তসাধারণকে সৃষ্টি করেন নি। স্মরণযোগ্য যে, ঈশ্বর প্রথমে আদম হবাকে সৃষ্টি করেছেন, কোন যাজককে সৃষ্টি করেননি। কেবলমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রেই যাজক শ্রেণীর সদস্য, ব্রতধারী নারী-পুরুষ (ব্রাদার-সিস্টার) এবং ভক্তসাধারণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ মহাসভাই প্রথমবারের মত ভক্তসাধারণকে নিজস্ব জীবন ও কর্মক্ষেত্রে যিশুর শিক্ষা পালনপূর্বক মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে এবং পবিত্র আত্মা থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহদানগুলো (বিভিন্ন গুণাবলী) ব্যবহারপূর্বক অপরের সেবা করাকে উৎসাহিত করে।

৪। মণ্ডলী হচ্ছে সেবক (সেবাকারী): কাথলিক মণ্ডলীর ঐশ আহ্বান হচ্ছে মঙ্গলবার্তা প্রচার ও বিভিন্ন সংস্কার (সাক্রামেন্ত) প্রদান এবং সমাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনে সেবা প্রদান। মঙ্গলবার্তা প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ন্যায্যতা বা ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে কাজ করা এবং পৃথিবীর মধ্যে সুস্থ পরিবর্তন আনায়ন।

এ সেবাদান পূর্ণাঙ্গ হবে যখন কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাগণ এ পৃথিবীতে গরীব-দুঃখী, অন্যায্যতার শিকার, পরিত্যক্ত, নির্যাতিত, পরাধীন, ও মানবাধিকার রহিত ব্যক্তিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সেবা দেবেন এবং নিজস্ব পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি উদার মন গ্রহণপূর্বক তাদের প্রয়োজনাদির প্রতি স্পর্শকাতর থাকবেন। এ মহাসভার বিশ্ব জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী নামক সংবিধানের ৩নং ধারায় বলা আছে, কাথলিক মণ্ডলী হচ্ছে সেবাকারী মণ্ডলী-ঠিক যিশু খ্রিস্টের মত, যিনি সেবা পাবার জন্য আসেননি; তিনি যিশু খ্রিস্টের মত, যিনি "সেবা পাবার জন্য আসেননি: তিনি এসেছেন সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসেবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে *(মথি ১০:৪৫)*"॥ **(চলবে)**

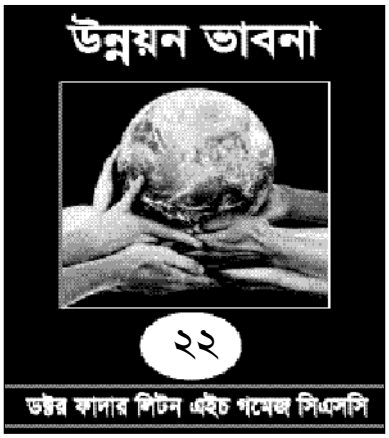

খ্রিস্ট জীবন্ত
করোনা দুর্যোগে তারাও পাবে তাঁর দয়া

১. অন্তরীণ সময়ে বার্ধক্যজনিত ব্যধিতে দুর্বল যারা অথবা যারা একাকী সেবাকেন্দ্রে আছে অথবা হাসপাতালে অসুস্থ অথবা নিজেদের বাড়িতে বিপদাপন্ন তাদের ভয় তারা জানে না আগামীকাল তাদের জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে। আবার যারা বেকার অথবা যাদের স্থায়ী কোন আয়ের উৎস নেই তাদের ভয় কীভাবে সন্তান ও আপনজনদের মুখে খাবার যোগান দিবে। অন্যদিকে রাষ্ট্রনেতাদের ভয় নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চয়তা কতটুকু হচ্ছে। এ সময়ে আমাদের সকলেরই নিজেস্ব ভয় আছে, আমাদের ভয় আমরা জানি। পোপ মহোদয় আহ্বান করেছেন- যেন ভয়কে জয় করতে সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা রাখি এবং নিয়মিত প্রার্থনা করি। উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কাগ্রস্ত শিষ্যদের অন্তরে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট জাগিয়ে তুলেছেন আত্মিক জীবনীশক্তি ও পরম ত্রাণশক্তি *(যোহন ২০:১৬-২৩)*। তখনই তাঁর ত্রাণকর্মের দায়িত্ব পালনে শিষ্যরা শক্তিমান হয়ে উঠেছে। সেই খ্রিস্ট যিনি জীবন্ত তিনি আজও আমাদের পাশে আছেন। বিশ্বাসীদের অন্তরে আশার জীবনীশক্তি জাগিয়ে থাকেন।

২. মাত্র তিনমাস আগেও আমাদের পরিচয় ছিল না ভাইরাস 'সার্স-কোভি-২' সংক্রামিত ব্যাধি করোনাভাইরাস 'কোভিড-১৯' সম্পর্কে। ভাইরাসের সংক্রামণের ভয়ে আতঙ্কিত এখন বিশ্ববাসী। কারণ সংক্রামণের ব্যাপকতা, চিকিৎসা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতায় দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকে। করোনা মহামারী বিশ্বব্যাপী সকলের মনের গভীরে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। মানুষ এখন দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিশ্বের কমবেশী সবকটি দেশে আক্রমণ চালিয়েছে। এ পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে কমপক্ষে ১,০১৫,৪০৩ এবং প্রাণ গেছে ৫৩,০৩০জনের আর বাংলাদেশে আক্রান্ত ৫৬ এবং প্রাণ গেছে ৬ জনের *(তথ্যসূত্র- বিডিনিউজ২৪.কম, ৩ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ)*। তারপরও ধারণা করা হচ্ছে অনেক তথ্য অগোচরে রয়ে গেছে। মৃত্যের সংখ্যা ইউরোপে ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে আর যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে মহামারীর নতুন সংক্রামণের কেন্দ্র।

৩. করোনার সংক্রামণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত অতি দরিদ্র কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষ। করোনা প্রাদুর্ভাবে শ্রমজীবী মানুষেরা আক্রান্ত হবার পাশাপাশি না খেয়ে থাকার আতঙ্কেও দিন কাটাচ্ছে। রাজ্যের নির্দেশিত অবরুদ্ধ সময় কাটাতে খেটে খাওয়া সাত দিনমজুর গাছের ওপর আশ্রয় নিয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের ভণ্ডিডি গ্রামের ঘটনা। কারণ অবরুদ্ধ সময় কাটাতে বাড়িতে পৃথক ঘর নাই। সাত যুবক সাত মাস আগে কাজের খোঁজে চেন্নাই গিয়েছিল। করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ায় তারা ট্রেনে যাত্রা করে বাড়িতে ফিরে। আপনজনেরা আগেই গাছের ওপর বিভিন্ন ডালে মাচা করে খাটিয়ে চাপিয়ে 'অন্তরীণ খুপরি' তৈরি রাখে। কাউকেই যেন বাড়িতে ঢুকতে না হয় সে জন্য গাছের নিচেই আলাদা রান্না ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আপনজনেরা রান্না উপকরণ গাছের তলায় রেখে যায়, যুবকরা রান্না করে খেয়ে গাছের ওপর শুয়ে-বসে দিন কাটায়। বান্দরবন পাহারে ম্রো পাড়ার প্রধানফটক পাড়া প্রধান কর্তৃক বাঁশ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেউ আর বাইরে যেতে পারবে না বা বাইরের লোক ভিতরে আসতে পারবে না। অবরুদ্ধ সময় কাটানোর এসবই বহু যুগের প্রচলিত প্রথা, বর্তমানেও অনুসরণ করা হচ্ছে।

৪. করোনার সংক্রামণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত কারাগারের বন্দিরাও। কারণ করোনা মোকাবেলার অপ্রতুল প্রস্তুতি, ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি জনবহুল, স্বল্প পরিসরে অধিক বন্দির জীবনযাপন, স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, নিম্নমানের ভেন্টিলেশন, অরক্ষিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা দায়ী করা হয়েছে। আমাদের দেশে ৬৮ কারাগারের মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে স্থাপন করা হয়েছে থার্মাল স্ক্যানার। বাংলাদেশের ১৩ কেন্দ্রিয় কারাগারসহ মোট ৬৮ কারাগারে প্রায় ৯৬ হাজারেরও বেশী কারাবন্দি রয়েছে, যেখানে ৩৬ হাজারের কিছু বেশী বন্দির জন্য ধারণ ক্ষমতা আছে। বাংলাদেশে ধারণক্ষমতার চেয়ে প্রায় তিনগুণের বেশি বন্দি রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি জনবল। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও জরিপ মোতাবেক বিদেশী নাগরিকসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে একশত ষাটজনের বেশী খ্রিস্টবিশ্বাসী বন্দি রয়েছে। তাদের মধ্যে তেরজন হাই সিকিউরিটি কারাগারে বন্দি আছে, কয়েকজনের বিচারের রায় মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হয়েছে। যুবক বয়সী যেমন রয়েছে তেমনি বৃদ্ধরাও কারাগারে বন্দিজীবন কাটাচ্ছে। বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ, বার্ধক্যজনিত ব্যধিতে অতি দুর্বল। মায়েদের সাথে কারা অভ্যন্তণীর আছে অনেক শিশুরাও। কিছু দিন আগে একটি মহিলা কেন্দ্রিয় কারাগারে ৬৯ জন শিশুর সাথে কয়েক ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে। তাদের সবার ছোট ছোট, ভিন্ন ভিন্ন গল্প আছে। যা শুনে প্রতিটি মানবিক হৃদয় দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর গভীর ভাবে বিচলিত হবে। কারা অন্তরীণে জন্ম হয়েছে এমন শিশুদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতে সময় দূরত্বে অবস্থানের নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে, কারাগারসমূহে মাইকিং করে স্বজনদের সাক্ষাৎ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে অথবা সংক্ষিপ্ত সময়ে সাক্ষাৎ সমাপ্ত করতে বলা হচ্ছে। মাদারীপুর কারাগারসহ করোনা সংক্রামণে ঝুঁকিপূর্ণ কারাগারসমূহে স্বজনদের সাক্ষাৎকারের নিয়মকানুন কঠোর করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব রেখে চলা বন্দিদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব কারণ ছোট এককক্ষে অনেকজন থাকতে হয়। চীনসহ আরো কয়েকটি দেশে কারাগারে ভাইরাস বিস্তারের ঘটনা ঘটেছে। সংক্রামণের ঝুঁকি এড়াতে ইরান ৮৫,০০০ বন্দিকে বিশেষ ব্যবস্থায় সাময়িক মুক্তি দিয়েছে। বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষ ৩,০০০ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার চিন্তা করছেন। যা অতি সামান্য সংখ্যক এবং খুবই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

৫. করোনার সংক্রামণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত যুদ্ধ-সংকটে গৃহহীন জনগোষ্ঠী। অবরুদ্ধ সময় গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধসমূহ হঠাৎই স্থবির হয়ে গেল। যুদ্ধারা জেনে গেছে মিসাইল দিয়ে চাইলেই মানুষ মারা যায় কিন্তু করোনা মারা যায় না। নাগরিকত্ব আইনে অপছন্দের মানুষদের দেশতাড়া করা যায় কিন্তু করোনা তাড়ানো যায় না। অনেক সীমানা প্রাচীরে ধারে মানুষ হত্যা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু করোনা প্রবেশ বন্ধ হয়নি। এটি ভাবনার বিষয় যে দেশে দেশে নির্মিত কংক্রিটের প্রাচীরগুলো মিথ্যা সীমানা। এগুলোর মূল্য খুবই কম কারণ করোনার কোন পাসপোর্টের প্রয়োজন পরে না, করোনা কোন সীমান্ত মানছে না। যুদ্ধগুলো মিথ্যা শক্তি, যা শান্তি আনতে পারে না। অভিবাসী বিষয়ক বাণীতে পোপ মহোদয় বলেছেন- সীমানা প্রাচীর মানুষ দ্বারা নির্মিত তবে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এক বিশ্বমণ্ডল, এক অভিন্ন বসতবাটি। একটু অনুভব করি, অসংখ্য অসহায় মানুষ সাড়া জীবন নিপীড়িত ও অত্যাচারিত। অন্যদিকে ভাইরাসটি আমাদের সকলের উপর সমানভাবে খুব অল্প সময় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। নিপীড়িত মানুষের তুলনায় আমাদের কষ্ট ক্ষণিকের।

৬. করোনার সংক্রামণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত অভিবাসী ও শরণার্থী জনগোষ্ঠী। চলমান সংঘাত ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল ও ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন। বিশ্বে ৭ কোটি শরণার্থী ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিতাড়িত জনগোষ্ঠী রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় কয়েকটি দেশেই রয়েছে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত অভিবাসী ও শরণার্থী জনগোষ্ঠী। জাতিসংঘের ইউএনএইচসিআর এর তথ্য অনুযায়ী- বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার শিবিরে গাদাগাদি করে বাস করছে দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগণ। উখিয়া উপজেলার কুতুপালং শরণার্থী শিবির হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠির শিবির যেখানে রয়েছে ছয় লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগণ। যারা মাত্র ১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় অবস্থান করছে। শরণার্থী শিবিরসমূহে অধিক উচ্চ ঘনবসতি, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অপ্রতুল স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও জনগণের অভ্যন্তরীণ আনাগোনা করোনা সংক্রামণের ঝুঁকি বেশি।

৭. এমন সময়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- করোনা আক্রান্তে ক্ষতবিক্ষত বিশ্ব কাঁদছে, আক্রান্তদের আপনজনেরা কাঁদছে, যারা আক্রান্ত তারা কাঁদছে। পবিত্র বাইবেলে লাজার মারা যাবার পরে তার বোন মার্থা, মারীয়া ও উপস্থিত লোকেরা কাঁদছে দেখে যিশু অন্তর থেকে কেঁদে ফেললেন *(যোহন ১১:৩৩-৩৫)*। খ্রিস্ট যিশু আজ আমাদের সাথে এ দুর্যোগ সময়ে কাঁদছেন। পোপ মহোদয় আমাদের সাথে আছেন এবং সকলের কান্নার সাথী হয়ে আছেন। প্রতিদিন তিনি গভীরভাবে আমাদের জন্য চিন্তিত এবং নিয়মিত প্রার্থনা উৎসর্গ করছেন। পোপ মহোদয় আহ্বান করেছেন - আমরা সকলে যেমন কাঁদছি তেমনি আমাদের কান্না যেন পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। অন্যদের জন্য যেন প্রার্থনা করি, দয়া দেখাই ও মঙ্গল কাজ করি। পোপ মহোদয় "খ্রিস্ট জীবন্ত" পত্রে যুবকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যা বলেছেন আজ সকলের জন্যও তা অর্থপূর্ণ- ক) ভালবাসা বিহীন জীবন শুষ্ক বা আকর্ষণহীণ জীবন; খ) ভবিষ্যতের উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব; গ) পাওয়ার চেয়ে দেওয়াতে আনন্দ বেশী; ঘ) ভালবাসা শুধুমাত্র কথায় নয়, কাজেও দেখাতে হয়।

৮. একদিন আমরা করোনার ভয়, আতঙ্ক ও সংকট উতরে যাব। মানুষ শিখে যাবে ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র থেকে শুরু করে কমিউনিজম রাষ্ট্র কেউই করোনা নিপীড়ন থেকে বাদ পরেনি। আমরা কী পারব সমাজে একটি যৌক্তিক পরিবর্তন ঘটাতে যেখানে মানবিক ও দয়াবান একটি সমাজ সৃষ্টি হবে। যারা ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সামষ্টিক মানুষের প্রয়োজন গুরুত্ব দিবে। করোনার সংকট মোকাবেলা পৃথিবীর মানুষ সংগঠিত ও পরস্পর সংযুক্ত। আমরা কী পারব সবাই মিলে আরো ভাল একটি পৃথিবী সাজাতে। যেখানে যুদ্ধ ফেলে পরিবেশ বিপর্যয়ের সুরক্ষার জন্য কার্যকর সিদ্ধান্ত নিবে। আমরা কী পারব যুদ্ধ সংকটে আর পরিবেশ বিপর্যয়ে ক্ষতবিক্ষত অভিবাসী ও শরণার্থীদের জীবনে আশার প্রদীপ জ্বালাতে। মানব ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ জীবনচক্রে এসে আমরা একটি বাসযোগ্য নিরাপদ অভিন্ন বসতবাটি গড়তে পারি। যেখানে মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে জড়ো হওয়া সম্পদ মানব কল্যাণে যাবে; মানুষের সেবা কিংবা মানবতা বিস্তারে রাষ্ট্র হাত বাড়াবে। যেখানে সারা বিশ্ব একত্রে রোগ-শোক-জ্বরা আর দুঃখ জয়ের বিরুদ্ধে লড়তে শিখবে। চলমান দুঃখ-কষ্টের পরে সেটাই হবে বিশ্বের রূপান্তরশীল পরিবর্তন, মানব জাতির পুনরুত্থান। মার্ক লিখিত মঙ্গলসমাচের (৪:৩৫-৪১) খ্রিস্ট যিশু আজ আমাদেরও বলছেন এতো ভয় কিসের, আমি তোমাদের সাথে আছি, বিশ্বাস জাগাও, পরম পিতার অনুগ্রহে থাক। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের সহযাত্রী কারণ খ্রিস্ট জীবন্ত। প্রার্থনায় তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখি, তাঁর অনুগ্রহ যাচ্ছা করি॥

ভালোবাসা

অর্নেট ব্লেইস পেরেরা

রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে
স্বপ্ন দেখাও তুমি
ভালোবাসার পরশ ওগো
দাও দিয়ে যাও তুমি।

ছিলাম আমি দূর জগতে
ঘৃণা ভরা দেশে
তোমার নিজ বাহু ডোরে
টেনে নিলে কাছে।

ভালোবাসার পরশ দিলে
বুকের গহীন কোণে,
ভালোবেসে ফেলেছি ওগো
তোমায় মনেপ্রাণে।

তোমার ছাড়া এক মুহূর্ত
ভাবতে নাহি পারি
তুমি আমার স্বপ্নের মাঝে
রং বেরং এর ঘুড়ি।

বিশ্বের এই দুর্যোগময় মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) চলমান পরিস্থিতিতে প্রভুযিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান পর্বোৎসব-২০২০ ও বাংলা নববর্ষ-১৪২৭ উপলক্ষে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা'র পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল খ্রিষ্ট-বিশ্বাসীসহ সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ব্যক্তিগত করণীয়-

০১। কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া
০২। বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করা
০৩। হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ না করা
০৪। হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় টিস্যু ব্যবহার করা
০৫। অসুস্থ পশু-পাখির সংস্পর্শে না আসা
০৬। মাছ-মাংস-সবজি ভালোভাবে সিদ্ধ করে রান্না করে খাওয়া
০৭। সভা, আড্ডা, গণজমায়েত ও গণপরিবহণ পরিহার করা
০৮। অসুস্থ হলে চিকিৎসাসেবা ব্যতীত পুরো সময় বাড়িতে থাকা
০৯। কুসুম গরম জল ও লেবুর শরবত পান করা
১০। জরুরি প্রয়োজনে আইইডিসিআর এর হটলাইন নম্বরে (০১৯৪৪৩৩৩২২২, ০১৯৩৭০০০০১১) যোগাযোগ করা

জনস্বার্থে

ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সদস্যদের করণীয়-

০১। একান্ত প্রয়োজন না হলে আপাতত ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য সেবাকেন্দ্র পরিহার করা।
০২। প্রয়োজনে পরিবারের পক্ষে একজন সদস্যের মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন করা।
০৩। অফিসে এলে অফিসের প্রবেশমুখে রক্ষিত জীবাণুনাশক বা বেসিনে ২০ সেকেন্ড সাবান পানি দিয়ে হাত পরিষ্কার করা।
০৪। কাজ শেষ হলে দ্রুততম সময়ে অফিস ত্যাগ করা।
০৫। অপ্রয়োজনে অফিসের কোনো ডিপার্টমেন্টে বা কর্মকর্তাদের অফিসে না যাওয়া।
০৬। নিজের বা পরিবারের কোন সদস্যের শ্বাস কষ্ট, জ্বর, কাশি বা নিউমোনিয়ার উপসর্গ থাকলে অফিসে না এসে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
০৭। জরুরি প্রয়োজনে চিফ অফিসার মি. জোনাস গমেজ, মোবা: ০১৭০৯৮১৫৪০২ বা মি. সুমান গাইন, মোবা:০১৭০৯৮১৫৪০৩ এ যোগাযোগ করুন।

একাধিকবার জাতীয় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীন ক্রেডিট ইউনিয়ন 'দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা'র পক্ষ থেকে এই দুর্যোগময় মহামারি করোনা-ভাইরাস (কোভিড-১৯) থেকে আমরা আপনাদের নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা কামনা করছি।

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
ডিসিসিসিইউলি, ঢাকা।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
ই-মেইল : t.cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.cccul.com
অনলাইন নিউজ : www.dcnewsbd.com অনলাইন টিভি: dctvbd.com

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
ডিসিসিসিইউলি, ঢাকা।

করোনা মোকাবেলায় কারিতাস বাংলাদেশের পদক্ষেপ

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ❖ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের তাণ্ডব চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে মহামারী ঘোষণা করেছে। চীনের উহান প্রদেশে এই ভাইরাসটির উৎপত্তি হয় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে। ইতোমধ্যে অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করা করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট কোভিড-১৯ রোগে বিশ্বের ২০৯টি দেশে/অঞ্চলে ১৩ লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে মারা গেছেন ৭৪ হাজারেরও বেশি মানুষ। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। সরকারি তথ্যমতে এযাবৎ এই ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে শতাধিক রোগী এবং এদের মধ্যে প্রাণহানী ঘটেছে ১৭ জনের। হঠাৎ সৃষ্ট এই স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য বিশ্বের কোন দেশই প্রস্তুত ছিল না। যেখানে উন্নত দেশগুলো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমন নিয়ন্ত্রণ করতে/কমাতে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশবাসীকে যেন ঘর থেকে বের হতে না হয় সেজন্য সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে ২৬ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এ সময়ে জনগণকে অতি জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাইরে না যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দেশের অতি দরিদ্র এবং স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে সরকারের এ নির্দেশ পালন করা পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। এরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের পক্ষে কয়েকদিনের খাবার মজুদ রাখা, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে করণীয় যেমন ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ঘরে থাকা, ইত্যাদি অনুসরণ করা কোনভাবেই সম্ভব হয়ে উঠছে না।

কারিতাস বাংলাদেশ মূলত এই শ্রেনির মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্যই দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে চিত্রটি ভিন্ন। কারণ বিশ্ব কারিতাস সংস্থার সদস্য দাতা দেশ যেমন ইতালি, স্পেন, আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশগুলোতে এই ভাইরাসের সংক্রমন অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করায় কোন দাতা সংস্থাই বর্তমানে নতুনভাবে অনুদান দিয়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্ব কারিতাসের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল লুইস আন্তনীয় ট্যাগলে তার ইস্টারের বাণীতে বলেছেন, 'কোভিড-১৯ যেমন কোন সীমানা জানে না তেমনি বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসারও কোন সীমা নেই।' তিনি সবার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, 'আমাদের সমাজ কি অর্থনৈতিক উদ্বেগ দূরে সরিয়ে রেখে দেখাতে পারে যে তারা সবার প্রতি যত্নশীল?

তাই কারিতাস বাংলাদেশ এর সীমিত সম্বল নিয়ে দেশের অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ায়। সকল কর্মীর অর্ধদিবসের বেতন, ত্যাগ ও সেবা অভিযানসহ অন্যান্য নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ সংকুলান করে ১৭ মার্চ হতে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কাজ শুরু করে। কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এরই মধ্যে কারিতাস এর ৮টি আঞ্চলিক অফিসের অধীনে মাঠ পর্যায়ে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ : ৫৭৫ বোতল + ১৫ লিটার
- ফেস মাস্ক বিতরণ: ৩,৪৭৮টি
- হাইজিন কিট(সাবান, হ্যান্ড ওয়াশ) বিতরণ: ৮,৬১২ টি
- হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ: ৮৭৪টি
- স্যাভলন বিতরণ: ১৫ লিটার
- জনবহুল স্থানে হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থাকরণ: ৪৩০টি
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ: ৬২টি
- খাদ্য-পুষ্টি সহায়তা প্রদান: ১,১০৬ পরিবারে
- করোনা হতে সুরক্ষার জন্য করণীয় বিষয়ক লিফলেট বিতরণ: ১৮৯,৫০০টি
- সুরক্ষার জন্য করণীয় বিষয়ক বার্তা সম্বলিত ফেস্টুন/ব্যানার: ৪৮১টি
- সুরক্ষার জন্য করণীয় বিষয়ক সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন: ৩টি
- স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দেয়া হয়েছে: ৭০৬,০৬৫ জনকে
- সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা: ৪,৭৩৪ জন
- বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ (১,৬০০ টাকা) সহায়তা বিতরণ: ৩৯৭ পরিবার
- প্রাথমিক ঔষধ বিতরণ সহায়তা প্রদান: ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন ১৮টি ডিসপেনসারীতে

কারিতাসের অফিস বন্ধ থাকলেও কর্মীরা ঘরে থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে প্রতিনিয়ত অন-লাইনে আলোচনা চলমান আছে। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবকগণের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সুরক্ষা বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ইতোমধ্যে কারিতাস দাতা সংস্থার অনুমোদন নিয়ে চলমান প্রকল্পের বাজেট হতে কিছু অর্থের সংস্থান করে পরবর্তীতে আরো কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করছে। যার মধ্যে আছে কর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও জনগণের জন্য করোনা হতে সুরক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চলমান রাখা। এছাড়াও আট লক্ষের বেশি মানুষের জন্য আরোও কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, যেমন - বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা; জীবিকা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা; কাজের বিনিময়ে অর্থ সহায়তা; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য মূলধন সহায়তা; ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন ডিসপেনসারীর মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও প্রাথমিক ঔষধ বিতরণ সহায়তা, ইত্যাদি। এই কাজগুলো কিভাবে করা হবে তার জন্য সংস্থাগতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এরই মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির কাজ হবে সমগ্র কারিতাসের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রস্তাবনা তৈরি করা। খুব শীঘ্রই এই কাজ সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কারিতাস সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য দাতা সংস্থার সাথেও যোগাযোগ রেখে ফান্ড/তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরম করুণাময় স্রষ্টার অসীম অনুগ্রহে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসী যেন অচিরেই এই ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারে সেই প্রার্থনা জানাই।

'বিশ্বের করোনাভাইরাস নিপাত যাক
পৃথিবীর সব মানুষ স্বস্তি পাক'

খ্রিস্টের পুনরুত্থান হোক আনন্দময়, বাংলা নববর্ষ প্রত্যেকের মাঝে গতিময় ও রোগহীন নতুন সূর্যের উদয় হোক -
দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ - এর পক্ষ থেকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন !!!

স্থায়ী আমানত
৬ বছরে দ্বিগুণ

৫ বছর	৪ বছর	৩ বছর	২ বছর	১ বছর	৬ মাস
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

- ৩ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- ৫ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
- ৩ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
- ৫ বছর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার স্থায়ী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

কোন স্থায়ী আমানত যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ ভাঙ্গাতে চায় তাহলে তাকে সোসাইটির নিয়ম অনুযায়ী সুদ প্রদান করা হবে।

আগষ্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান, দি এমসিসিএইচএস লিঃ

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি, দি এমসিসিএইচএস লিঃ

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.1978
Church Community Centre, 9 Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka - 1215, Bangladesh ☎ +88 02 9113841, +88 02 9117661 ✉ info@mcchsl.org 🌐 www.mcchsl.org

BOOK POST

চলতি সংখ্যার মূল্য - ৩০ টাকা মাত্র

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.wklypratibeshi.org